শহীদ আব্দুল মালেক রচনাবলী

www.priyoboi.com

চেকোশ্লাভিকিয়ায় সোভিয়েত প্রভাবমুক্ত হওয়ার একটি সংগ্রাম

'আমার ভয় হয়, সোভিয়েত শাসকরা এমন একটি পোলিশ সমাজতন্ত্রী সরকারই চান যা পোল্যান্ডকে তাদের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করবে' –কথাগুলো বলেছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পোলিশ প্রধান জেনারেল সিকোরসকী। সে আজ পঁচিশ বছর আগের কথা। সিকোরসকীর সেদিনের সে আশঙ্কা অমুলক ছিলো না। শুধু পোল্যান্ডে নয় গোটা পূর্ব ইউরোপই আজ রাশিয়ার তল্পীবাহক সাজতে বাধ্য হয়েছে। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরী রাশিয়ার তাবেদারী পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলো, প্রতিফল হিসেবে বুদাপেস্টের রাজপথে হাঙ্গেরীর মুক্তিকামী জনতার উষ্ণ রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। আর আজ সেই একই কারণে চেকোস্লাভাকিয়ার ১ কোটি ৪৩ লক্ষ মানুস নিজেদের আজাদী নতুন করে রাশিয়ার কাছে বন্ধক রাখতে বাধ্য হচ্ছে, সোভিয়েত ট্যাঙ্ক আর সশস্ত্রবাহিনী প্রাগ ও ব্রাতিস্লাভার রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে ফিরছে। অপরাধ শুধু এটুকু যে, চেকোশ্লাভাকিয়ার জাগ্রত জনতা আর রাশিয়ার তল্পী বহন করতে রাজী ছিল না। তারা বলেছিলো 'আমাদের দেশের ভালমন্দ আমরাই বুঝি'।

বিশে আগস্টের রাত। চেক জনসাধারণ যখন নিন্দ্রায় বিভোর তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও পূর্ব জার্মানী ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত পাঁচটি দেশের দু'লক্ষ সশস্ত্র বাহিনী সীমান্ত পেরিয়ে চেকোশ্লাভাকিয়ার ভূখন্ডে প্রবেশ করে। প্রায় ২৫০ টি রুশ T-৪৫ ট্যাঙ্ক শ্লোভাক রাজধানী ব্রাতিশ্লাভার রাস্তায় টহল দিতে থাকে। বিমানবন্দর, রেলওয়ে স্টেশন, টেলিফোন ও বেতারকেন্দ্রসমূহ দখল করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য। চেকোশ্লাভাক কম্যুনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারী আলেকজান্ডার ডুবচেক, প্রেসিডেন্ট লুডভিক সভোবোদা, জাতীয় পরিষদ প্রেসিডেন্ট জোসেফ সমরকোভস্কীকে বন্দী করে রাখা হয়। সুসজ্জিত রুশ বাহিনীর সাথে মোকাবিলা করার মত সামর্থ ছোট চেকোশ্লাভাকিয়ার ছিলো না। কিন্তু তার আজাদী পাগল জনতা রাশিয়ানদের সাথে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে এবং ডুবচেকের সংস্কার আন্দোলনের প্রতি ঐক্যবদ্ধ আনুগত্য প্রকাশ করে।

ক্রেমলিন নেতৃবৃন্দের সাথে বোঝাপড়ার উদ্দেশ্যে সভোবোদা ও ডুবচেককে অবশেষে মস্কোতে নিয়ে যাওয়া হয়। সংবাদপত্রের উপর পুনরায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ ও দেশকে গণতান্ত্রিকরণের পদক্ষেপ রহিত করার অঙ্গীকারে চেক নেতৃবৃন্দ ক্রেমলিন কর্তাদের সাথে সমঝোতায় আসতে সক্ষম হন।

চেকোশ্লাভাকিয়ায় রাশিয়ার এই সশস্ত্র অভিযানের ফলে প্রায় ৫০ জন নাগরিক নিহত এবং ৩৩০ জনেরও অধিক আহত হয়েছে। সরকারী হিসেব মতে আগস্টের এই জবরদখলের ফলে কমপক্ষে ৫ হাজার চেক নাগরিক পশ্চিম দেশসমূহে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছে। International Rescue Committee (IRC)-এর রিপোর্টে এদের সংখ্যা ৩০ হাজার। এদের অধিকাংশই অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, ইতালি ও ফ্রান্সে আশ্রয় নিয়েছে।

দুনিয়ার প্রায় প্রতিটি বিবেকবান জাতিই রাশিয়ার এই বর্বরোচিত হামলার নিন্দা করেছে। এমনি বিশ্বের ৮৮ টি কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে মাত্র ১০টি রাশিয়ার এই হামলাকে সমর্থন করেছে। ইতালি ও ফ্রান্সের গোঁড়া মস্কোপন্থী কন্যুনিস্ট পার্টি ও কঠোর ভাষায় এর নিন্দা করেছে।

রাশিয়ার সাম্প্রতিক চেকোশ্লাভাকিয়া দখলের কারণ অনুসন্ধান করলে চেক ইতিহাসের পাতা উল্টাতে হয়। পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহে নিয়ে রাশিয়া ওয়ারশ ঐক্যজোট গঠন করেছিল। চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাশিয়া অস্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে শুরু করে। চেকোশ্লাভাকিয়ায় ডুবচেকের নেতৃত্বে গত বছরের জানুয়ারি থেকে এক সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়। দেশের বুদ্ধিজীবি ও যুবসমাজের ব্যাপক সমর্থনের মাধ্যমে এ আন্দোলন চলতে থাকে। এতেই সোভিয়েত শক্তি প্রমাদ গণে।
১৯১৮ সালে চেকোশ্লাভাকিয়া প্রজাতন্ত্র হিসেবে স্বীকৃতি পায়। চেক ও শ্লাভাক ছাড়াও এখানে ত্রিশলক্ষ জার্মান বসবাস করতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে হিটলার চেকোশ্লাভাকিয়ায় বসবাসকারী জার্মানদের উসকানী দিতে থাকে এবং সুইজারল্যান্ডের ওপর কর্তৃত্ব দাবী করে বসে। তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নারভিল চেম্বারলেনের প্রচেষ্টায় ১৯৩৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর মিউনকে হিটলারের সাথে এক আপোষ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু পরবর্তী অক্টোবর মাসের প্রারম্ভেই হিটলার মিউনিক চুক্তি ভঙ্গ করে এবং সুইজারল্যান্ডের দখল করে। চেকোশ্লাভিকিয়ায় তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড বেন্সি দেশত্যাগ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর বেন্সি আবার দেশে ফিরেন। এ সময় থেকেই চেকোশ্লাভিকিয়ায় সোভিয়েত প্রভাব পড়তে আরম্ভ করে।

ক্রেমলিনের ইবচ্ছামাফিক ক্লিমেন্ট গটওয়াল্ড প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। ১৯৪৮ সালে সোভিয়েত সাহায্যপুষ্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে কম্যুনিস্টরা পূর্ণক্ষমতা দখল করলো। চেকোশ্লাভাক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা গ্যারিগ মাসারিকের পুত্র পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন মাসারিক নিহত হলেন। স্টালিনপন্থী গটওয়াল্ডের অত্যাচারে দেশবাসী অতিষ্ট হয়ে ওঠে। স্ট্রালিনের মৃত্যুর পর গোটা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া জুড়ে যখন স্ট্যালিন বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় তখন অ্যান্টনি নভোতনী গটওয়াল্ডের স্থান দখল করেন। কিন্তু সমগ্র পূর্ব ইউরোপে অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। ১৯৫৬ সালের দিকে ক্রেমলিনের আভ্যন্তরীণ বিরোধ, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরীর মুক্তিসংগ্রাম সমাজতন্ত্রী একনায়কত্ববাদের নাগপাশে আবদ্ধ জনগণের চোখ খুলে দিতে থাকে। পূর্ব ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। গত বছরের জানুয়ারীতে প্রবল গণবিক্ষোভ ও ছাত্র অসন্তোষের মোকাবিলায় নবোতনী ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ডুবচেক তার স্থান দখল করেন। আটমাস পর্যন্ত ডুবচেকের সংস্কার আন্দোলন অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকে। ডুবচেকের উদার নীতি বিশেষ করে সংবাদপদের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, সভা সমিতির অনুমতি দান এবং পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা রাশিয়াকে ক্ষেপিয়ে তোলে। এর পরিণতি হিসেবেই রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনী চেকভূমিতে প্রবেশ করে।

রাশিয়ার এই জবরদখল চেকোশ্লাভিকিয়ার জনগণের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। হামলাকারী রাশিয়ার সাথে কোন সমঝোতাকেই চেকরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এ জন্যই সমঝোতার চারমাস পরে রুশ হামলার প্রতিবাদে চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের একুশ বছর বয়স্ক ছাত্র জন প্যালাক নিজদেহে অগ্নি সংযোগ করে আত্মহত্যা করেন। জানুযারির এই ঘটনা শেষ বারের মত আর একবার চেক জনগণকে সজাগ করে দেয়। নীরব অশ্রু বর্ষণ করতে করতে তারা প্যালাকের শব-শোভাযাত্রার অনুগমন করে। চেকোশ্লাভাকদের অশ্রুসিক্ত চোখে আজ নীরব প্রতীক্ষা করে তারা রাশিয়ার তাবেদারী থেকে মুক্তি পাবে।

দাঙ্গা বিক্ষত মালয়েশিয়া

গত মে মাসে মালয়েশিয়া পক্ষকালব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের শিকারে পরিণত হয়। মালয়েশিয়ার সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মালয়ী ও চীনাদের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়। এই আত্মঘাতি দাঙ্গায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিরাট। এতে কমপক্ষে ১৭৭ জন লোক নিহত, বহু আহত এবং ৬ সহস্রাধিক লোক গ্রেফতার হয়। দাঙ্গা চলাকালে সান্ধ্য আইন জারী, সেনাবাহিনী তলব ও জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল। সংবাদপত্রে প্রকাশনা সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল। দাঙ্গার ফলে নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে দেয়া হয় এবং জরুরী ক্ষমতাবলে মালয়েশিয়ার 'জাতীয় অপারেশনাল কাউন্সিল' এখন দেশ শাসন করছে। এখানে সেখানে দু'একটি খন্ড ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটলেও মালয়েশিয়ার অবস্থা আস্তে আস্তে স্বাভাবিকতার দিকে ফিরে যাচ্ছে।

মালয়েশিয়ার এই দাঙ্গার শুরু ৯ই মের একটি ঘটনাকে পুঁজি করে। ঐদিন পুলিশের সাথে সংঘর্ষে মালয়েশিয়ার বামপন্থী 'লেবার পার্টির' একজন সদস্য নিহত হলে শ্রমিকদল একটি শব শোভাযাত্রা বের করে। শোভাযাত্রাকারীরা লাল পতাকা ও মাও সে তুংয়ের প্রতিকৃতি বহন করে এবং উসকানীমূলক শ্লোগান দিতে থাকে। পরদিন মালয়েশিয়ার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে টেংকু আবদুর রহমান পরিচালিত এবং মালয়ী, চীনা ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত 'এলায়েন্স পার্টি' পূর্বাপেক্ষা কম আসন লাভ করে। চীনা-গোষ্ঠীর দুর্বলতাই এর অন্যতম কারণ। অন্যদিকে সিংগাপুর প্রভাবিত এবং চীনা যুদ্ধবাজ যুবকদের নিয়ে গঠিত 'চায়নীজ ডেমোক্র্যাটিক এ্যাকশন পার্টি (DAP) নির্বাচনে পূর্বাপেক্ষা অধিক আসন লাভ করে। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পরপরই DAP এর উচ্ছৃখল চীনা যুবকরা শোভাযাত্রা বের করে এ মালয়ীদের বিরুদ্ধে উসকানীমূলক শ্লোগান দিতে শুরু করে। এথেকেই হাতাহাতি ও দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। পর্যবেক্ষকদের মতে এই দাঙ্গার পেছনে ইন্ধন যুগিয়েছে চীনা এবং সিংগাপুর সরকার। মালয়েশিয়ার এই দাঙ্গার কম্যুনিস্টরা খুবই তৎপর হয়ে ওঠে। তাদের কাছ থেকে বিপুল সংখ্যক বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র আটক করা হয়েছে বলে সরকারী মহল দাবী করেছে। মালয়েশিয়ার বুকে কম্যুনিস্ট গেরিলা ও চীনা বংশোদ্ভূত অধিবাসীদের রাষ্ট্রবিরোধী ও ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ এই প্রথম নয়। এর আগে আর একবার কম্যুনিস্ট এজেন্টরা মালয়কে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের কবলে নিক্ষেপ করেছিল।
মালয়েশিয়ায় বহু জাতির বাস। এর মধ্যে মালয়ী, চীনা ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীই প্রধান। মালয়ীরা মুসলমান। ত্রয়োদশ শতকে আরব বণিকদের মাধ্যমে ইসলাম এখানে প্রচারিত হয়েছিল। মালাক্কার শাসনকর্তা ইসলাম গ্রহণের পর পরই সেখানে মুসলিম সালতানাতের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ শাসকেরা পেনাং মালাক্কা ও সিংগাপুর নিয়ে মালয় ফেডারেশন গঠন করে। অতঃপর ব্রিটেনেরই তত্ত্বাবধানে ১৯৬৩ সালের দিকে মালয়, সিংগাপুর, সারাওয়াক ও সাবাহ রাজ্যের সমন্বয়ে মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠিত হয়। অবশ্য পরে লিকুয়ান ইউএর নেতৃত্বে ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে সিংগাপুর মালয়েশিয়া ফেডারেশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।
মালয়েশিয়ায় মালয়ী মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫১ জন। চীনাদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। ব্রিটিশ শাসনামলে চীনারা এখানে মজুর ও ব্যবসায়ী হিসেবে আগমন করে। ব্রিটিশ প্রভুদের সহযোগিতায় চীনা আগন্তুকেরা শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হয়েওঠে। ধীরে ধীরে চীনারা শিল্প ও ব্যবাসায় বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারী হয়ে ওঠে। এভাবে গোটা দেশের অর্থনীতিও তাদেরই কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। মালয়ী মুসলমানদের অধিকাংশই দরিদ্র কৃষকে পরিণত হতে থাকে। মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যক্ষ টুঙ্কু আবদুল আযীয নির্ণীত হিসাবমতে মালয়ের মাথাপিচু আয় ৭৫০ মালয়ান ডলার হওয়া সত্ত্বেও একজন সাধারণ মালয়ীর মাসিক আয় ৫০ থেকে ৬০ মালয়ান ডলারের অধিক নয়। অপরদিকে দেখা গেছে রাজনৈতিক মতামতের ব্যাপারে চীনা আগন্তুকদের দৃষ্টি সমুদ্রপারের চীন ভূখন্ডের দিকেই। এই পররাজ্য আনুগত্য (Extra territorial Loyalty) মালয়েশিয়াকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সমস্যা বহুল দেশে পরিণত করেছে।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্র মালয়েশিয়া। সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিক দিয়ে ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের সাথে এর মিল আছে। সমুদ্রপাড়ের চীনের সাথে এর সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের খুব কমই সংযোগ রয়েছে। অন্যদিকে শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে 'প্যান মালয় ইসলামী পার্টি' মালয়ী মুসলমানদের মধ্যে ইতোমধ্যেই যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মালয়েশিয়ার এ অবস্থা মালয়ের চীনা অধিবাসী এবং সিংগাপুর ও কম্যুনিস্ট চীন সরকারকে অনেককানি ভাবিয়ে তুলেছে। পর্যবেক্ষকদের অনেকেরই ধারণা, মালয়েশিয়ার সাম্প্রতিক দাঙ্গায় চীনের অদৃশ্য হাত ছিল। চীনা যুদ্ধবাজ নাগরিকেরা কেবল মালয়েশিয়ায়ই নয় বরং বার্মা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি যে কোনো দেশেই তারা বসতি স্থাপন করেছে সেখানেই একটা না একটা হাঙ্গামা বাধাতে চেষ্টা করেছে। সুদূর ব্রিটেনের পুলিশও এদেশের হাত থেকে রেহাই পায়নি। গত ক'বছর আগে মালয়েশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ায় তাদের বাধানো হাঙ্গামা ইতিহাস কোনদিন ভুলবে না। চীনের সাথে ইন্দোনেশিয়ার দহরম মহরমের সুযোগ নিয়ে চীনারা বালিদ্বীপ ও অন্যান্য এলাকায় কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। এরা সেখানে বার বার দাঙ্গা বাঁধিয়েছে। শেষে চূড়ান্ত সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কম্যুনিস্টরা ইন্দোনেশিয়ার ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করেছে। এতে ৬ থেকে ১০ লক্ষ্য মানুষকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছিল।

গত কয়েক বছরের ঘটনাবলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন দেশে অবস্থানকারী চিনা বংশোদ্ভূতদের সাথে যখনই স্থানীয় লোকদের বিরোধ বেধেছে তখনই কম্যুনিস্ট চীন চীনাদের সংযুক্ত করার পরিবর্তে তদেরকে উসকানী দিয়েছে। আর মালয়েশিয়ায়ও যখন চীনা নাগরিকেরা পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা পালন করছে তখন চীনের চিরাচরিত সেই নীতির ব্যতিক্রম হয়নি।

ভিয়েতনাম: পুঁজিবাদী ও সম্রাজ্যবাদী চক্রের নির্মম শোষণ ক্ষেত্র

গত কিছুদিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন বলেছিলেন, ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরিসমাপ্তি এমন কতকগুলো নীতির ভিত্তিতে হতে হবে যা প্রমান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ তরান্বিত করবে। নিকসনের উপরোক্ত বক্তব্য সত্যি আন্তরিক না এশিয়ায় নতুন মার্কিন ঘাটি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তা বলা শক্ত। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যে খুব তাড়াতাড়িই ভিয়েতনাম থেকে পাততাড়ি গুটাতে হচ্ছে এতে কারো দ্বিমত নেই। ভিয়েতনামে আমেরিকানদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি মার্কিন জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে বিক্ষুদ্ধ করে তুলেছিল। যার ফলে সাবেক প্রেসিডেন্ট জনসন পুনরায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত নেন, উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ বন্ধ করেন এবং প্যারিসে শান্তি সম্মেলন আহ্বান করেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধে এ পর্যন্ত চৌত্রিশ হাজারেরও অধিক মার্কিন সৈন্য নিহত হয়েছে। বর্তমানে প্রতি সপ্তাহে নিহতের সংখ্যা তিন শতের কাছাকাছি। যুদ্ধের ব্যয়ভার হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতি বছর তিন হাজার কোটি ডলার খরচ করতে হচ্ছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ গোটা দুনিয়ায় আমেরিকার মর্যাদা অনেকখানি হ্রাস করেছে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের ক্ষয়ক্ষতি এর চেয়েও বেশি। কম্যুনিস্ট গেরিলা বাহিনীর আক্রমণে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জনজীবন অতিষ্ট। অন্য দিকে গত চার বছরের ক্রমাগত মার্কিন বোমা বর্ষণের ফলে উত্তর ভিয়েতনামের অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল।

অজন্মা আর আমলাতন্ত্রের ফলে পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি উত্তর ভিয়েতনামের নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে হ্যানয়ের পত্র পত্রিকা প্রায়ই খবর প্রকাশ করে থাকে। উত্তর ভিয়েতনামী জনগণের যে বিপ্লবী প্রেরণা সম্বল করে যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছিলো তাও অনেক কমে আসছে। যুদ্ধে বিজয় লাভের অনিশ্চয়তা হ্যানয়ের কর্তা ব্যক্তিদের মধ্যেও যথেষ্ট মতদ্বৈত্যতার সৃষ্টি করেছে। নব্যপন্থী কম্যুনিস্ট বুদ্ধিজীবিরা যুদ্ধ সম্পর্কে বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছে। ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠা হলে তারা উত্তর ভিয়েতনাম গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন বলে তাদের ধারণা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাশিয়া আমেরিকার সাথে সহ-অবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। ভিয়েতনামের এ ব্যয়বহুল অনিশ্চিত যুদ্ধকে আর বেশি দিন টিকিয়ে রাখা রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আলোচ্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই হ্যানয়, মুক্তিফ্রন্ট, সায়গন ও আমেরিকার মধ্যে প্যারিসে চতুঃশক্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বৃহৎ শক্তিগুলো কর্তৃক প্রভাবান্বিত ও তাবেদার এলাকা গঠনের পরিণতি হিসেবেই ভিয়েতনাম যুদ্ধের সূচনা হয়। ভিয়েতনাম স্বাধীনতা লাভ করেছিল ১৯৪৫ সালে। কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি চুয়ান্ন সালের জেনেভা চুক্তির পরবর্তী কয়েকদিন মাত্র ভিয়েতনামীরা স্বাধীনতা সুখ ভোগ করতে পেরেছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লোলুপ জিহ্বা তাদের সে স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল। ভিয়েতনামী জনগণের এ দুর্ভাগ্যের কারণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সই প্রথম ভিয়েতনামে উপনিবেশ স্থাপন করে। যুদ্ধে জার্মানীর কাছে উপর্যুপরি মার খেয়ে বিশ্বশক্তি হিসেবে ফ্রান্সের মর্যাদা অনকেখানি ক্ষুণ্ন হয়েছিল। হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধারের আশায় প্রেসিডেন্ট দ্যাগল ভিয়েতনামের মাটিতে নিজের ভাগ্য খুঁজতে গিয়েছিলেন বস্তুতঃ ইন্দোচীনে ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি ছিল পুনরায় তার বিশ্বশক্তির মর্যাদা লাভের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৪ সালে দিয়েন বিয়েন ফুর যুদ্ধে ভিয়েতনামী জাতীতাবাদীদের হাতে প্রচন্ড মার খেয়ে ফরাসীরা ইন্দোচীন ছাড়তে বধ্য হয়। ইন্দোচীন এর অনেক আগে থেকেই কুম্যনিস্ট ও অকম্যুনিস্ট জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর কারা ক্ষমতা দখল করবে এ নিয়ে উভয় গ্রুরুপের মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা চলে আসছিল। এদের পেছনে ইন্ধন যোগাচ্ছিল যথাক্রমে রাশিয়া, চীন এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। ব্যাপক সামরিক হস্তক্ষেপের আশঙ্কা এড়ানোর জন্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ভাগ্যান্বেষণকারী এই শক্তিত্রয়ের ইচ্ছামাফিক ইন্দোচীনকে স্বাধীন কম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েতনামে ভিক্ত করা হলো। কম্যুনিস্ট ও অকম্যুনিস্ট জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধরোধ করার জন্য ভিয়েতনামকে আবার ১৭শ অক্ষাংশ বরাবর দু'ভাগে ভাগ করা হলো। দক্ষিণ ভিয়েতনামে গঠিত দিয়েম সরকার আমেরিকার তল্পীবাহক সাজলো আর হ্যানয়ের কম্যুনিস্ট সরকার রাশিয়া ও চীনের তাবেদারে পরিণত হলো। দক্ষিণ ভিয়েতনামকে মুক্ত করার জন্য উত্তর ভিয়েতনামের পরোক্ষ সহযোগীতায় ভিয়েতনাম গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠল। উত্তর ভিয়েতনাম সরকার দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভিয়েতকং গেরিলাদের গোপন অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করতে শুরু করলো। দক্ষিণ ভিয়েতনামে গেরিলা তৎপরতা এবং উত্তর ভিয়েতনামী সেনাবাহিনীর অনুপ্রেশের অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৫ সালে সায়গনে সৈন্য পাঠাতে শুরু করলো এবং ঐ বছরের জুলাই থেকে উত্তর ভিয়েতনামের উপর বোমাবর্ষণ আরম্ভ করে দিলো। মূলতঃ স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই ভিয়েতনামে গৃহযুদ্ধ চলে আসছে। আমেরিকার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে এ যুদ্ধ আজ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য গতক বছর মে মাস থেকে প্যারিসে শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বোমাবর্ষণ বন্ধ হয়েছে সত্য কিন্তু এখনও ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। এজন্য দায়ী আমেরিকানদের গড়িমসি ও আন্তরিকতার অভাব, আর অন্যদিকে কম্যুনিস্টদের একইসাথে যুদ্ধ ও আলোচনা নীতি। গত কয়েক মাস যাবৎ শান্তি আলোচনায় যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করার জন্য নিকসন সরকার আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে। নিকসন ইতোমধ্যেই হ্যানয়ের সাথে গোপন বৈঠকের সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামের হঠকারী প্রেসিডেন্ট নগুয়েন ভ্যান থিউও মুক্তিফ্রন্টের সাথে গোপন আলোচনায় রাজী আছেন বলে ঘোষণা করেছেন। ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়ত সম্ভব হতে পারে কিন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও স্বার্থপরতার মুখে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তা সুদূর পরাহত।

সিরিয়ায় আবার সামরিক বিপ্লব

মধ্যপ্রাচ্যে যখন চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে, ইসরাইল যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহন করছে, বৃহৎ শক্তিগুলো যখন চাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম শক্তিকে ঘায়েল করতে, সিরিয়ায় তখন আর একটি সামরিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হলো। নুরুদ্দিন আতাসীর সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হাফিজ আল আসাদ ক্ষমতা দখল করেছেন। প্রাক্তন নেতাদের অনেকেই আটক রয়েছেন। বিপ্লব রক্তপাতহীন বলে দাবী করা হয়েছে। তবে প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধান আবদুল করিম জুন্দীরদ রহস্যজনক মৃত্যুতে একথা মনে হয় যে, বিপ্লব রক্তপাতহীন নয়।

সিরিয়ার এই রাজনৈতিক ভাঙ্গাগড়া ও স্থিতিহীনতার জন্য আরব সমাজতন্ত্রী বাথ পার্টি এককভাবে দায়ী। একথা সিনিয়ার গত তেইশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়। ১৯৪৬ সালে এপ্রিল মাসে সিরিয়া ফরাসী শাসনমুক্ত হয়। সেই থেকেই বামপন্থীরা ক্ষমতা দখলের সুযোগ খুঁজে আসছিল। ১৯৪৯ সালে বাথ নেতাদের পরিচালনায় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাসমী আল জাইন এর নেতৃত্বে রক্তাক্ত সামরিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির নির্দেশ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তী দুই দুইটি সরকারকে উৎখাত করে আদিব সিসাকলীর নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়। পার্টি এবার সমাজতন্ত্রীদের চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করে। বামপন্থীরা সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে এবং একই সাথে সরকার বিরোধী গোপন সংস্থাও গড়ে তোলে। ১৯৫৮ সলে মিসর-সিরিয়া সমন্বয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র গঠনের পর বামপন্থীরা প্রেসিডেন্ট নাসেরের জনপ্রিয়তাকে পুঁজি করে আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করে।

১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে বাথপন্থীরা সিরিয়ায় পুর্ণ ক্ষমতা দখল করে। লে. জেনারেল আমিন আল-হাফিজের নেতৃত্বে গঠিত সরকার সমস্ত বিরোধীদলের অবসান ঘটিয়ে একদলীয় শাসন কায়েম করে। আমিন আল-হাফিজ সরকারের নির্যাতনের প্রথম শিকার হয় ইখওয়ানুল মুসলিমুনের কর্মীরা। তিন বছরপর বাথ পার্টির চরমপন্থী গ্রুপ মেজর জেনালের সালাহ্ আদিবের নেতৃত্বে আবার সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটায়। ড. নুরুদ্দিন আতাসী ও ইউসুফ জাইয়েনের নেতৃত্বে চরমপন্থী সমাজতন্ত্রী সরকার গঠিত হয়। গত ১লা মার্চ নরম পন্থীরা জেনারেল হাফিজ আল আসাদের নেতৃত্বে আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। আসাদ বিদেশে অবস্থানরত বাথনেতাদের সাথে যোগাযোগ করে সরকার গঠনের চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে ইরাকের বাথপন্থী জেনারেল বাকেরের সরকারের সাথে সৌহার্দ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। ১৯৪৯ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সিরিয়ার নয়টি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছ। অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, প্রতিটি বিপ্লবের জন্য দায়ী সমাজবাদী বাথ পার্টির অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও নেতৃত্বের কোন্দল। পার্টির আন্তর্জাতিক কমান্ডের সাথে রুশপন্থী সিরীয় কম্যুনিস্টদের একটা ভাল রকমের যোগসাজশ রয়েছে। ১৯৫৯ সালে সিরিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ায় এদের নেতৃবর্গ পূর্ব ইউরোপে আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর সোভিয়েত নির্দেশে এরা বাথপার্টি এবং কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। গোঁড়া মস্কো সমর্থক আতাসী সরকারের শাসনামলে রুশপন্থী ঝানু কম্যুনিস্ট খালিদ বাগদাশ প্রাগ থেকে সিরিয়ায় আগমন করেন এবং নেপথ্যে থেকে সরকারী নীতি নিয়ন্ত্রণ করেন। বর্তমান বিপ্লবের ক'মাস আগে বাগদাশ চিকিৎসার জন্য মস্কো গমন করেন। এই সময়ে অনুষ্ঠিত সিরীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনগুলোতে দামেস্কে নিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত নুরুদ্দিন মহিউদ্দিনও যোগদান করতেন বলে বৈরুতের 'আন-নাহার' পত্রিকা তথ্য প্রকাশ করেছে। সিরিয়া, ইরাক ও মিসরে একচেটিয়া প্রবাব বিস্তারের পরিকল্পনা সামনে রেখে সোভিয়েত রাশিয়া আরব বিশ্বের এই ভাঙ্গাগড়ায় ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে পুঁজিবাদ দুনিয়ার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ইসরাইল আবার যুদ্ধের পাঁয়তারা করছে। আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদ, পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ আজ গোপনে হাত মিলিয়েছে তাদের সাধারণ শত্রু মুসলিম শক্তির বিনাশ সাধনে।

মধ্যপাচ্যঃ বৃহৎ শক্তিবর্গের রাজনৈতিক ক্রীড়ামঞ্চ

সম্প্রতি 'লন্ডল অবজারভারের' প্রতিনিধি মি. কোনেথ হ্যারিসের সাথে এক সাক্ষাতকারে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন বলেছেন, "মধ্যপ্রাচ্যে ভবিষ্যত কোন যুদ্ধবিগ্রহ কেবলমাত্র মধ্যপ্রাচ্যের জাতিসমূহকেই সংঘর্ষশীল করে তুলবে না বরং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বৃহৎ শক্তিগুলোকেও যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেবে। আমরা সভ্যতার এই জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করার জন্যই কি ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়নি? দুনিয়ার মুসলমানদের বিরোধীতা সত্ত্বেও আমেরিকা, রাশিয়া ব্রিটেন, ফ্রান্স মিরে এই বিষফোঁড়ার প্রতিষ্ঠা করেছিল। গত বিশ বছর যাবত এই বৃহৎ চতুঃশক্তির মধ্যপ্রাচ্যের এই কালসাপকে লালন পালন করে আসছে। চতুঃশক্তির মুনাফেকি নীতির কথা আজ আর কারো অজনা নেই। একদিকে তারা নিরাপত্তা পরিষদে বসে শান্তি প্রস্তাব পাশ করেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি মিশন প্রেরণ করেন আর অন্যদিকে ফ্যান্টম ও মিরেজ বিমান এবং আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্রে ইসরাইলকে সুসজ্জিত করে তোলেন। এই বৃহৎ শক্তিবর্গের সহযোগিতায়ই ইসরাইল ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধে সিনাই, গাজা, সিরয়ার গোলান মালভূমি এবং পবিত্র জেরুজালেমসহ জর্দান নদীর পশ্চিচম তীরের এক বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে নেয়। অধিকৃত এলাকাসমূহ থেকে আরবদেরকে বিতাড়িত করে সেখানে ইহুদীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইসরাইলী বিশেষজ্ঞরা সিনাই উপদ্বীপের তৈলসমৃদ্ধ এলাকার পেট্রোলিয়াম উত্তোলনের জন্য কূপ নির্মাণ করছে এবং তেলের পাইপে মিসরের জীবনী শক্তি নিঃশেষে শুষে নিচ্ছে।

যুদ্ধশেষে ইহুদীরা মুসলিম সম্পত্তির অনেক ক্ষতিসাধন করে। ডিনামাইট ও বুলডোজার দিয়ে অনেক বাড়ী-ঘর ও মসজিদ ধ্বংস করে দেওয়া হয়। জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল উথান্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি মি. ব্যালনান তার রিপোর্ট এরূপ ১৩৫টি বাড়ির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'যুদ্ধের, ধ্বংসস্তুপের সাথে আরো নতুন নতুন ধ্বংসক্রিয়া যোগ করা হচ্ছে।'

'জেরুজালেম পোস্টের' খবরে প্রকাশ, ব্যাপক খননকার্যের মাধ্যমে ইহুদীরা মসজিদুল আকসা ও মসজিদুল সাখরার রূপ পরিবর্তন করতে চলেছে। অধিকৃত এলাকাসমূহ গ্রাস করার জন্য ইসরাইল ইরান প্লান, এশকল প্ল্যান প্রভৃতি নানা পরিকল্পনা উদ্ভাবন করছে। সম্প্রতি লন্ডনের ইকনমিস্ট-এ প্রকাশিত 'অ্যালোন প্ল্যান' (Allon plan) ইহুদীদের সম্প্রসারণবাদের আর একটি কারসাজি। ডিসেম্বরের শেষদিকে ইসরাইলে একখানি মানচিত্র প্রকাশিত হয় এবং তা 'World zionest Congress' এর নেতৃস্থানীয় সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। উক্ত মানচিত্রে অধিকৃত আবু আখিলা, আল-আরিশ এবং গাজা থেকে শারমুল শেখ পর্যন্ত আকাবা উপসাগরের তীরভূমিকে ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত দেখানো হয়েছে। ইসরাইলী পররাষ্ট্র মন্ত্রী মোশে দায়াল ঘোষণা করেছেন– 'ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রধানত সামরিক নিরাপত্তার জন্যই সিনাই উপদ্বীপ এবং গোলান মালভূমি প্রয়োজন। আমাদেরকে অবশ্যি গোলান মালভূমিতে বসবাস আরম্ভ করতে হবে, সিনাই উপদ্বীপকে সুরক্ষিত করতে হবে এবং জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরকে অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক দিক দিয়ে ইসরাইলের সাথে যুক্ত করে ফেলতে হবে।'
মধ্যপ্রাচ্যের এই অশান্তকর পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ ও বৃহৎ চতুঃশক্তি কেবল টালবাহার নীতিই গ্রহণ করেছে। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে সাধারণ পরিসদের এক সিদ্ধান্তক্রমে ড. গানার জারিংকে আরব ও ইসরাইলের মধ্যে আলোচনা করার জন্য নিয়োজিত করা হয়। কিন্তু জারিং মিশন মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। অনদিকে ইসরাইলের যুদ্ধংদেহী মনোভাব ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি ইসরাইলী কমান্ডোবাহিনী বৈরুত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ১৩ খানা বেসামরিক বিমান ধ্বংস করে দিয়েছে। বৃহৎ শক্তিবগের পক্ষ থেকে নিন্দা করা হলেও

এতে ইসরাইলের কিছু যায় আসে না। আমেরিকার ফ্যান্টন বিমানের এক বিরাট চালান ইতোমধ্যেই ইসরাইলে পৌঁছার অপেক্ষা করছে।

রাশিয়ার মুনাফেকী নীতি আজ আর কারো অজানা নেই। গত জুন যুদ্ধে আরবদের প্রকাশ্য সমর্থন দেয়ার পেছনে রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল বিরাট। ভূমধ্যসাগরে মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহরের মোকাবিলা করার জন্য রাশিয়ান যুদ্ধ জাহাজসমূহকে ভূমধ্যসাগরে নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু বাধা ছিলে বৈরী তুরস্ক। কেবলমাত্র আরবদের সাহায্য করবে এই আশ্বাসেই তুরস্ক সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজকে বসফরাসে প্রবেশের অনুমতি দেয়। ইহুদীবাদের মোকাবিলায় দুনিয়ার মুসলমান যখন ঐক্যজোট গঠন করতে প্রয়াসী ছিল রাশিয়া নানা কৌশলে তা ব্যর্থ করে দেওয়ার করেছে। এমনকি পারস্য উপসাগরীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো যখন প্রতিরক্ষা জোট গঠন করতে চেষ্টা করছিল রাশিয়া তাকেও সাম্রাজ্যবাদের কারসাজি বলে অভিহিত করেছে।

সম্পতি জাতিসংঘের কুটনৈতিক মহলসূত্রে প্রকাশ, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়া একটি নতুন প্রস্তাবের কথা চিন্তা করছে। যার ফলে ইসরাইলকে সিনাই এলাকামুক্ত করে দিতে হবে। জেরুজালেম ও অন্যান্য আরব ভূখন্ডের কথা এ প্রস্তাবে উল্লেখ নেই বলেই ওয়াকিফহাল মহল সূত্রে প্রকাশ। এক্ষেত্রে রাশিয়ার চাল অত্যন্ত পরিস্কার। সিনাই এলাকামুক্ত হলে সুয়েজ খাল নৌচলাচলের উপযোগী হবে এবং ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত রুশ নৌবহর পাক-ভারত উপমহাদেশের উপকূল পর্যন্ত টহল দিয়ে ফিরতে পারবে।

বৃহৎ শক্তিবর্গ বিশেষ করে আমেরিকা ও রাশিয়ার এই চালবাজি ও টালবাহানার সুযোগে ইসরাইল ব্যাপক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। পশ্চিম দুনিয়ার ওয়াকিফহাল মহলসূত্রে প্রকাশ, ইসরাইল জেটজঙ্গী বিমান ও আনবিক অস্ত্র উৎপাদনে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অনেকের ধারণা ইসরাইলের হাতে এখন একটি আনবিক বোমা রয়েছে। London Institute for Stontegic Studies এর প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায়, ১৯৬৪ সালে ফরাসী সাহায্যে ইসরাইলের ডিমোনাতে ২৪ থারমাল মেগাওয়াটের যে আনবিক চুল্লী স্থাপিত হয়েছে তা থেকে বছরে একটি আনবিক বোমা তৈরি হতে পারে। জনৈক ব্রিটিশ বিমান বিশেষজ্ঞের মতে ১৯৭০ সালের মধ্যেই ইসরাইল এমন ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবন করতে সক্ষম হবে যার ধ্বংসক্রিয়া ২৮০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

ইসরাইলের এই সামরিক প্রস্তুতি এবং বৃহৎশক্তিবর্গের এই নিষ্ক্রিয়তা ও পরোক্ষ সাহায্যের মোকাবিলায় আরবরা আজো সংঘবদ্ধ হতে পারেনি। খার্তুম কনফারেন্সের প্রস্তাবসমূহকে এখনও কার্যকরী করা হয়নি। আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে তো কোন্দল লেগেই আছে।

সামরিক জান্তার কবলে সুদান

গত ২৫শে মে সুদানে সামরিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩৫ বছর বয়স্ক মেজর জেনালের জাফর আল-নিমারীর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর জুনিয়ার অফিসাররাই এ অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। সামরিক অভ্যুত্থানের অব্যবহিত পরেই একটি বিপ্লবী পরিষদ গঠিত হয়েছে। জেনারেল নিমারী নিজেকে বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান ও সুদানের প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছেন। সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দাযিত্ব তার হাতেই রয়েছে। হাইকোর্টের সাবেক বিচারপতি আবু বকর আওয়াদাল্লাহর নেতৃত্বে ২৩ সদস্যের একটি মন্ত্রীসভাও গঠিত হয়েছে।

সুদানের সামরিক জান্তা শাসনতন্ত্র বাতিল করে দিয়েছে। সুদান প্রজাতন্ত্রের নাম পরিবর্তন করে 'সুদান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' রাখা হয়েছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট ইসমাঈল আজহারী ও প্রধানমন্ত্রী আহমদ আহগুব তাদের নিজস্ব বাসভবনে আটক রয়েছেন বলে জানা গেছে রাজনৈতিক দলসমূহ বেআইনী ঘোষিত হয়েছে। সংবাদপত্রের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। অনেকগুলোর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেছে। সাঁজোয়া গাড়ী গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাহারা দিচ্ছে, নিয়মিত সেনাবাহিনী ছাড়াও ছত্রী সৈন্যরা রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

সুদানের সামরিক জান্তা বিরোধী দলীয় রাজনীতিক বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের সর্ব বৃহৎ ইসলামী আন্দোলন ইখওয়ানুল মুসলিমুনের কর্মীদেরকে পাইকারী হারে গ্রেফতার করেছে। জেনারেল নিমারীর ঘোষণা অনুযায়ী বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই মোট ৬৪ জন বেসামরিক এবং ১৩ জন সামরিক অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সামরিক জান্তার প্রথম শিকারে পরিণত হয়েছেন ইখওয়ানের তরুণ কর্মী উমর শেখ মোহাম্মদ সালেহ। পাঁচ সদস্য বিশিস্ট এক সামরিক ট্রাইবুনালে তাঁর বিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কঠোর নিরাপত্তা ও কড়া প্রহরায় এই বিচার অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে খবরে প্রকাশ।

সুদানের নয়া বামপন্থী আরব সমাজবাদের সমর্থক। ক্ষমতা দখল করে প্রধানমন্ত্রী আওয়াদাল্লাহ তাঁর প্রথম বেতার ভাষণেই ঘোষণা করেছেন, 'সুদান এক্ষেণে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে।' সুদানী সমাজতন্ত্রকেই নয়া সরকারের নীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। মন্ত্রীসভাও গঠন করা হয়েছে কম্যুনিস্ট ও আরব সমাজতন্ত্রীদের নিয়ে। মন্ত্রীসভার সদস্য জোসেফ কিরনেক ও মাকাবী মোস্তফা ঝানু কম্যুনিস্ট। সুদান কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ফারুক বুইমা প্রেসিডেন্সিয়াল এ্যাফেয়ার্সের টেস্ট মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছে এবং আমীন তাহের, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, তাহা গফুর যথাক্রমে বিচার, কৃষি ও শ্রমমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছে। এরা সবাই আরব সমাজতন্ত্রের সমর্থক। স্বয়ং জেনারেল নিমারী একজন প্রোগ্রেসিভ ন্যাশনালিস্ট এবং প্রধানমন্ত্রী আওয়াদাল্লাহ নাসেরবাদের সমর্থক। সুদানের নয়া পররাষ্ট্রনীতি মস্কো ঘেঁষা ও নাসেরপন্থী।

সুদানের বামপন্থী সামরিক অভ্যুত্থান অনেকের কাছেই একটা বিস্মরকর ব্যাপার। বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে; কারণ ইসলামী শরিয়ত ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে মাহদী সুদানীর নেতৃত্বে যে সুদানী জনগণ সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সুদানকে আজাদ করেছিল তারা আজ কিভাবে ইসলাম বিরোধী সমাজবাদকে কবুল করবে? যে জনগণ ইব্রাহীম আবুদের সামরিক ব্যক্তিতন্ত্রকে সহ্য করেনি তারা কি আর একটি সামরিক জান্তাকে প্রশ্রয় দেবে? সুদীর্ঘ দশ বছর যারা ইসলামী শাসনতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছে তারা কি ইসলামী জীবনবিধান ছাড়া অন্যকিছু গ্রহণ করবে? সুদানের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে বর্তমান সামরিক বিপ্লব একটা বিস্ময় সত্য, কিন্তু গত ১০ বছরের সুদানী রাজনীতির ভাঙ্গাগড়া পর্যালোচনা করলে এটাকে অনেকটা স্বাভাবিক পরিণতিই বলা চলে।
সুদান স্বাধীনতা লাভ করেছিল ১৯৫৬ সালে। সেই থেকে সুদানে শুরু হয়েছে ব্যাপক রাজনৈতিক টানাপোড়ন। মাহদী সুদানী সুদানকে স্বাধীন করেছিলেন সত্য; কিন্তু তার অনুগামীদের মানস ও চরিত্রে ইসলামী জীবনবোধ সৃষ্টি করে যেতে পুরোপুরি সক্ষম হননি। সুদানী মুসলমানের অন্তরে ইসলামের জন্য অকৃত্রিম দরদ ও যজবা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তাদের সামনে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোন কাঠামো রেখে যাওয়ার সময় পাননি। যার ফলে সুদানের বৃহত্তম সংগঠন উম্মা পার্টি একটি ধর্মীয় গোত্রে পরিণত হয়েছিল; কোন ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি! সুদানে কমপক্ষে ২৮টি রাজনৈতিক দল রয়েছে। এদের মদ্যে উম্মা পার্টি, ন্যাশনাল ইউনিয়নিস্ট পার্টি ও ইখওয়ানুল মুসলিমুন অন্যতম। কমুনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীরা সেখানে সংখ্যায় খুবই নগণ্য। তাও জনতার চাপে পার্লামেন্ট কম্যুনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সংখ্যা নগণ্য হলেও কম্যুনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীরা সুদানের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় পদ দখল করে বসেছিল। বর্তমান মন্ত্রীসভার প্রায় সবাই কম্যুনিস্ট, সাবেক সরকারের আমলে এরা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মাকাবী মস্তফা শিক্ষক সিন্ডিকেটের সদস্য ছিলেন, সুদান কম্যুনিস্ট পার্টির

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ফারুক বুইসা সুদানী শিক্ষক ইউনিয়নের সেক্রেটারী ছিলেন। অন্যদিকে বর্তমান বিচারমন্ত্রী আমিন তাদের সুদানী আইনজীবি সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ফ্রাকাল্টির ডীন এবং শ্রমমন্ত্রী তাহা গফুর একজন মনস্তত্ত্ববিদ ছিলেন। এরা সবাই বহু পূর্ব থেকেই বামপন্থী সোশ্যালিস্ট। স্বয়ং আবু বকর আওয়াদাল্লাহ সুদান পার্লামেন্টের স্পীকার ও হাইকোর্টের সহকারী প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে আরব সমাজতন্ত্রের কলেমা পড়েছিলেন। এভাবে সমাজতন্ত্রী ও আধা সমাজতন্ত্রীরা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে ব্যাপক অনুপ্রবেশ করেছিল।

অন্যদিকে সুদানের ভৌগোলিক ও নৃতাত্বিক দিকও বর্তমান বিপ্লবের জন্য অনেকখানি দায়ী। ভৌগোলিক দিক দিয়ে সুদান উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে বিভক্ত। উত্তরাঞ্চলের প্রায় সবাই মুসলমান। অন্যদিকে দক্ষিণাঞ্চলে খ্রিষ্টান ও আফ্রিকান আদিম অধিবাসীদের বাস। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই দক্ষিণাঞ্চলের অমুসলিম ও অনারবরা ক্রমাগতভাবে বিদ্রোহ করে এসেছে। সুদানের সেনাবাহিনী গত ১২ বছর যাবৎ উক্ত বিদ্রোহের মোকাবিলা করে এসেছে। কিন্তু বিদ্রোহের অবসান হয়নি। তাদের এই বিদ্রোহে ইন্ধন যুগিয়েছে মিসর, কংগো, কেনিয়া ও উগান্ডা। চীন ও ইসরাইলের সামরিক ট্রেনিং প্রাপ্ত গেরিলারা ১৯৬৫ সালে দক্ষিণ সুদানে সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়। নৃতাত্বিক দিক দিয়ে সুদানে ৫৭২টি উপজাতির বাস। এদের অনেকগুলোর ভিতর কলহ লেগেই আছে। অন্যদিকে মাত্র দেড় কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত সুদানে ২৮ টি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব রয়েছে। ক্ষমতা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সুদানের রাজনীতিকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কোন্দল ও দক্ষিণাঞ্চলের বিদ্রোহ দমণ করতেই সুদান সরকারকে বেশি মাত্রায় ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। যার জন্য অতীতের সরকারগুলো সুদানের অর্থনীতিকে মজবুত করে গড়ার কাজে বড় বেশি একটা নজর দিতে পারেনি। একে তো দরিদ্র দেশ তাতে আবার বেকার সমস্যা সুদানের অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। অন্যদিকে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নটিও একটা বিরাট রকমের সংকট সৃষ্টি করেছিল। জনতার দাবী অনুযায়ী স্বাধীনতার দীর্ঘ ১২ বছর পর সরকার একটি ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু কতিপয় স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতা ও কম্যুনিস্টদের ষড়যন্ত্রে শেষ পর্যন্ত সে শাসনতন্ত্র জারী হতে পারেনি। সুদান সরকারের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও দক্ষিণাঞ্চলের সমস্যার সুযোগ নিয়ে কুম্যুনিস্টরা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানে সক্ষম হয়েছে।

উল্লেখিত সামরিক বিপ্লবের পেছনে আর একটি কারণ রয়েছে। আর এ কারণটি সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রের সমভাবে বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে। সেটা হলো বৈদেশিক শক্তির হস্তক্ষেপ। সুদানও বৈদেশিক হস্তক্ষেপ মুক্ত ছিল না। মিসর, কেনিয়া উগান্ডা ও কংগো দক্ষিণ সুদানের বিদ্রোহীদের উসকানী দিয়েছে। চীন ও ইসরাইল তাদেরকে গেরিলা ট্রেনিং দিয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়া একদিকে প্রত্যক্ষভাবে সুদানের নেপথ্যে ষড়যন্ত্রে ইন্ধন যুগিয়েছে, অন্যদিকে মিসরের মাধ্যমে বিদ্রোহীদের উসকানী দিয়েছে। বস্তুতঃ আফ্রিকার এই বৃহত্তম ও দরিদ্রতম দেশটিতে প্রভাব বিস্তারের জন্য রাশিয়ার ব্যবস্তার অন্ত ছিল না। জনৈক রুশ পর্যটক একবার সুদান ভ্রমণে এসে সোভিয়েত পুস্তক-পুস্তিকা ও ম্যাগাজিনের স্বল্পতা দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। অন্যদিকে সুদানে চীনা সাহিত্যের ব্যাপক ছড়াচড়ি দেখে তার এ দুঃখ আরো কয়েকগুন বেড়ে গিয়েছিল। সুদানে সামরিক বিপ্লবের পরপরই রুশপন্থী আরব সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলো সুদানের সামরিক জান্তাকে স্বাগতম জানিয়েছে। অন্যদিকে সপ্তাহ খানেক পর সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র প্রাভদা মন্তব্য করেছে যে, সুদানের সামরিক অভ্যুত্থান 'ইসরাইলী নির্যাতন ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে দৃঢ় করবে। পত্রিকাটি আরো মন্তব্য করেছে, গত পাঁচ বছরে সুদানে গণতন্ত্রের অগ্রগতিকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যাহত করে রাখা হয়েছিল এবং কম্যুনিস্ট বিরোধিতা সুদান সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এথেকে অনুমিত হয়, এই অভ্যুত্থানে রাশিয়ার কোন হাত আছে।

সামরিক জান্তা সুদানের ক্ষমতা দখল করেছে। জেনারেল নিমারী খোলাখুলি ঘোষণা করেছেন যে, ১০ বছর পূর্ব থেকেই এর গোপন প্রস্তুতি চলছিল। তাদের সাহায্য করেছে বেসামরিক কম্যুনিস্টরা আর উৎসাহ যুগিয়েছে বিদেশী চরেরা। সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসাররাই এ অভ্যুত্থানের পুরোভাগে। তবে তারা শেষ রক্ষা করতে পারবে কিনা, তাতে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ইতোমধ্যেই সুদানে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং সুদানের মত দেশে কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকা কি হবে এ নিয়ে বামপন্থী শিবিরে তীব্র মতভেদ শুরু হয়েছে। লন্ডন অবজারভারের খবরে প্রকাশ, সুদানের প্রখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা আবদুল খালেক মাহবুবকে এ জন্যই আটক রাখা হয়েছে। কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল মাহবুব মিসরের ন্যায় সুদানে আরব সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে কম্যুনিস্ট পার্টির বিলোপ সাধনের বিরোধী। অন্যদিকে সুদানের ইসলামী জনতাও এই সমাজতন্ত্রী জান্তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছে। লন্ডন টাইমসের খবরে প্রকাশ, ওমদুরমানে বিক্ষোভের আয়োজন চলছে। ওমদুরমানে অবস্থিত সুদানী জনগণের প্রিয় নেতা মাহদী সুদানীর সমাধিকে এখনও সাঁজোয়া গাড়ী ও কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে জনসাধারণের নাগালের বাইরে রাখা হয়েছে। অন্য এক খবরে প্রকাশ, সুদানে বিক্ষোভ ও সশস্ত্র লড়াই চলছে। প্রধানমন্ত্রী আওয়াদাল্লাহ ঘোষণা করেছেন, 'আমরা যে কোন প্রতিবিপ্লবকে নস্যাৎ করে দেব, নইলে নিজেরাই

নিহত হবো।' এ থেকেও মনে হয়, সেখানে প্রতিবিপ্লবের আয়োজন চলছে। বর্তমান অবস্থা যাই হোক না কেন ইসলামী রেনেসাঁ অন্দোলনের অগ্রসেনা মাহদী সুদানীর সুদান যে এই সমাজতন্ত্রী সামরিক জান্তাকে সহ্য করবে না, তা মনে করা অস্বভাবিক নয়।

ইরিত্রিয়াঃ বিবেকের একটি জিজ্ঞাসা

‘মাত্র কয়েকটি পুরনো ব্রিটিশ রাইফেল আর তেরজন গেরিলা নিয়ে শুরু হয়েছিল আমাদের মুক্তি সংগ্রাম উনিশ শো বাষট্টি সালের দিকে। আজ আল্লাহর মেহেরবানীতে আমাদের মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে হাজারেরও উপরে আর ঐ মুক্তিসংগ্রামে যোগ দিয়েছে ইরিত্রিয়ার মজলুম মুসলিম জনতা।’ কথাগুলো বলছিলেন পাকিস্থান সফররত ইরিত্রিয়ান মুক্তিফ্রন্টের প্রতিনিধি জনাব আলী বারহাতু। সত্যিকথা বলতে কি সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী চক্রের কারসাজিতে ইরিত্রিয়া সমস্যাটি ধামাচাপা পড়ে রয়েছে। তাদেরই চক্রান্তে ইরিত্রিয়ার মজলুম মুসলমানের আওয়াজ মুসলিম দুনিয়ার কান পর্যন্ত পৌঁছাতে পাচ্ছে না। মুসলিম আফ্রিকার এই দেশটি লোহিত সাগরের উপকূল বরাবর ৬৭০ মাইল বিস্তৃত। এর পশ্চিম সীমান্ত বরাবর সুদান, দক্ষিণে ইথিওপিয়া এবং দক্ষিণ পূর্বে সোমালী প্রজাতন্ত্র অবস্থিত। আয়তনে ৪৮ হাজার ৩৫০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ। জনসংখ্যার অধিকাংশই মুসলমান।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইরিত্রিয়া উসমানীয় খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৮৫ সালে ইরিত্রিয়া ইতালির উপনিবেশে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালির পরাজয়ের ফলে ব্রিটেন ইরিত্রিয়ার শাসনভার গ্রহণ করে। ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ইরিত্রিয়া ব্রিটিশ সামরিক শাসনের শিকারে পরিণত হয়। ইতোমধ্যে ইথিওপিয়ার খ্রিস্টান সম্রাট হাইলে সেলাসী ব্রিটেনের সাথে ষড়যন্ত্র করে ইরিত্রিয়াকে নিজস্ব সাম্রাজ্যভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কারণ লোহিত সাগরে প্রবেশ করার জন্য ইতিওপিয়ার উপনিবেশবাদী সম্রাট সেলাসীর জন্য ইরিত্রিয়া ছিল একান্তভাবেই অপরিহার্য। ইথিওপীয় সম্রাটের ষড়যন্ত্র সফল হলো। ইরিত্রিয়ার ২৫ লক্ষ মানুষের বিরোধিতা উপেক্ষা করে ১৯৫০ সালের ২রা ডিসেম্বর জাতিসংঘ চক্রের এক প্রস্তাবনার ফলে ইরিত্রিয়াকে ইথিওপীয় দস্যুদের হাতে তুলে দেওয়া হলো। পাকিস্থান ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের প্রবল বিরোধিতা সত্তেও ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া মিলিয়ে এক ফেডারেশন গঠন করা হলো। ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া সম্পর্কের জন্য চারটি নীতি নির্ধারণ করা হলো–

১. ইরিত্রিয়া ইথিওপিয়া ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত একটি স্বায়ত্ব শাসিত ইউনিট হবে।
২. ঘরোয়া ব্যাপারে ইরিত্রিয়া সরকারের গণতন্ত্রের মূলনীতি ভিত্তিক শাসনতান্ত্রিক, প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা থাকবে।
৩. ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া হতে সমান সংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি ফেডারেশন কাউন্সিল গঠিত হবে। ফেডারেশনের সাধারণ ব্যাপারসমূহ পরামর্শ দেয়ার জন্য কাউন্সিল বছরে একবার মিলিত হবে। ইরিত্রিয়ার জনগণ শাসন ও বিচার ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করবে এবং ফেডালের সরকারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তারা জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব করবে।
৪. ফেডারেল সরকার এবং ইরিত্রিয়া প্রত্যেকেই তার অধিবাসীদের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাব, ভাষা নির্বিশেষে সামরিক ও মৌলিক অধিকার ভোগ করার আজাদী দান করবে। কিন্তু এ ঘোষণাগুলো ছিলো একটা বিরাট রকমের ধাপ্পাবাজী। ঘোষনাগুলোর কোন মর্যাদাই সম্রাট রাখেননি। বরং ফেডারেশন গঠন করার অব্যবহিত পরেই শুরু হলো ব্যাপক নির্যাতন ও গণহত্যা। ইথিওপিয়ার অত্যাচার থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য হাজার হাজার শিশু, বৃদ্ধ ও নর-নারী পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হলো। কেবলমাত্র সুদানের কামালা প্রদেশেই ৪০ হাজার ইরিত্রিয়ান নর-নারী আশ্রয় নিয়েছে। ১৯৫৭ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ইরিত্রিয়ান মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশা বর্ণনা করে একটি স্মারকলিপি প্রদানের অপরাধে ইরিত্রিয়ান সুপ্রীম ফেডারেল কাউন্সিলের মোহাম্মদ উমর কাজীকে দশ বছর এবং হাজী ইমাম মুসা এবং হাজী সুলায়মান আহমদকে চার বছরের কারাদন্ড প্রদান করা হয়। অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। ইথিওপিয়ার নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই ইরিত্রিয়ার মুক্তিপাগল জনতা মুক্তিফ্রন্ট গঠন করে ১৯৬২ সালে। সোমালিয়া, সিরিয়া, সুদান আলজিরিয়া, ইরাক, ও দক্ষিণ ইয়ামেনে এর দপ্তর গড়ে উঠেছে। নির্বাসিত ইরিত্রিয়ানরা এর সহযোগিতা করে যাচ্ছে। মজলুম ইরিত্রিয়া আজ মুক্তির দিন গুণছে। তার জনগণের চোখের অশ্রু মানবতার সামনে আজ এক বেদনাদায়ক জিজ্ঞাসা।

চীন-রাশিয়া সীমান্ত সংঘর্ষ

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ প্রদর্শক নিকোলাই বুখারিনের ধারণা ছিল কেন্দ্রভিগ প্রবণতা (Centripetal tendencies) একদিন বিশ্বসমাজতন্ত্রকে ক্রেমলিনের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ করবে। আজ সে ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। সমাজতন্ত্র দুনিয়ার নেতৃত্ব বহুকেন্দ্রিকতা (Polycentrism) আজ সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতাবাদের (Communist internationalism) স্বপ্নকে মিসমার করে দিয়েছে। কুম্যুউনিস্ট দুনিয়ার আদর্শকি দ্বন্দ্ব আজ প্রায় ক্ষেত্রেই সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ নিচ্ছে। চীন-রাশিয়ার বর্তমান সীমান্ত সংঘর্ষকেও এই পটভূমিতেই বিশ্লেষণ করা যায়। তথাকথিত 'জনগণতান্ত্রিক' রাষ্ট্রসমূহের নেতত্বের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার লোভ এবং আঞ্চলিক সম্প্রসারণবাদী মনোভাব বিশ্ববাসীকে আর এক নয়া উপনিবেশবাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। গত ২রা মার্চ 'উসুরী' নদীর সীমান্ত বরাবর চীন-রাশিয়ার মধ্যে সাম্প্রতিককালের প্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হয়। উভয় পক্ষেই বহুসংখ্যক লোক হতাহত হয়। এরপরও কয়েক দফা আক্রমণ পরিচালিত হয়। সোভিয়েত বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য সীমান্তরক্ষী ও সেনাবাহিনীকে তৎপর করা ছাড়াও চীন নারী ও শিশুদের এক বিরাট বাহিনীকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত বরাবর সমাবেশ করছে বলে নয়াচীন বার্তা প্রতিষ্ঠানের খবরে প্রকাশ। রাশিয়াও তরুণ স্বেচ্ছাসৈনিক ও সীমান্তের রক্ষা বাহিনীকে আমুর ও উসুরী নদীর তীর বরাবর সন্নিবেশিত করেছে। এই সংঘর্ষকে চীন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং সোভিয়েত সংশোদনবাদের ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেছে আর অন্যদিকে রাশিয়া একে পিকিং-বন-ওয়াশিংটন গোপন আঁতাত বলে চিত্রিত করেছে।

চীন-রাশিয়ার বিরোধ নতুন নয়। দশ বছর পূর্বে সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ পদ্ধতি নিয়ে যে আদর্শিক বিরোধের সূচনা হয় আজ তাই সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই দশ বছর একে অন্যকে 'সংশোধনবাদী', 'সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের এজেন্ট' বলে অখ্যায়িত করেছে। এই কিছুদিন আগেও রুশ পত্রিকা 'কম্যুনিস্ট' এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে মাও-এর সমালোচনা করে বলা হয়েছে, 'অন্ধ আনুগত্য ও সেনানিবাসের শৃঙ্খলা দিয়ে মানবসত্তাকে মেশিনের ক্ষুদ্র স্ক্রু'তে পরিণত করা হয়েছে।' বাহ্যত এই বিরোধ মার্কসবাদ ও লেলিনবাদের ব্যাখ্যার বিতর্ক মনে হলেও, আসলে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নেতৃত্বের লোভ ও আঞ্চলিক সম্প্রসারণবাদী মনোভাবই বর্তমান সংঘর্ষের মূলীভূত কারণ। ক্রেমলিন নেতারা মনে করেন যে, যেহেতু সমজবাদের প্রথম প্রয়োগক্ষেত্র রাশিয়া এবং শক্তি ও প্রতিপত্তিতে রাশিয়া কম্যুউনিষ্ট দুনিয়ার সেরা তাই গোটা সমাজতন্ত্রী বিশ্বের নেতৃত্ব কেবল তারাই দিতে পারেন। নতুন প্রণীত ব্রেজনেভ নীতির (Breshnev Principle) মধ্যে তারা একথাই ঘোষণা করেছেন। অন্যদিকে পিকিং নেতারা মনে করেন যে, যেহেতু চীন কম্যুউনিস্ট বিশ্বের বৃহৎ ও জনবহুল দেশ এবং মার্কসবাদ লেলিনবাদের সর্বশেষ সংস্করণ মাওসেতুং দিতে পেরেছেন তাই নেতৃত্ব তাদেরই।

বর্তমান সংঘর্ষের মুল কারণ হিসেবে সম্প্রসারণবাদী মনোভাবের প্রশ্নটি আরো গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৫-৪৯ সালের গৃহযুদ্ধের অবসানের পর থেকেই চীনে প্রচন্ড খাদ্য সংকট দেখা দেয়। মাও-এর সমস্ত কৃষি পরিকল্পনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে থাকে। স্ট্যালিনের অনুকরণে গৃহীত যৌথ কৃষি (Agricultural Collectivization) নীতিও খাদ্য সমস্যা দূর করতে ব্যর্থ হয়। আজ তাই ৭৫ কোটি মানুষের খাদ্যসমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্য চীনকে নতুন কৃষিযোগ্য ভূমি দখল করতে হবে। এ ব্যাপারে চীনের নজর উত্তর সীমান্তের গম প্রধান সাইবেরিয়া এবং দক্ষিণের চাউল উৎপাদনকারী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে। এজন্যই উত্তর দিকে চীন আমুর ও উসুরী নদী বরাবর চীন-সোভিয়েত সীমান্ত রেখা নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। বস্তুত ১৯৬৩ সাল থেকে চীন-সোভিয়েত সীমান্ত বিরোধ প্রবলাকার ধারণ করে এবং সীমান্ত এলাকায় কয়েক দফা উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়। রাশিয়ার ক্রুশ্চভের শাসনামলে চীনের এই উত্তরমুখী সম্প্রসারণবাদ বড় বেশি একটা সুবিধে করতে পারেনি। কিউবা সংকটের পর ক্রুশ্চড চীনের সম্প্রসারণবাদ দমনের দিকে মনোযোগ দেন এবং চীনকে বিশ্ব কম্যুনিস্ট আন্দোলন থেকে বহিস্কার করার সিদ্ধান্ত নেন।

অন্যদিকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থান, প্রচুর খাদ্যশস্য এবং বাণিজ্য সম্পদের জন্য চিরদিনই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের আকর্ষণের বস্তুতে পরিণত হয়ে এসেছে। দীর্ঘদিন যাবত ব্রিটিশ, ডাচ, পর্তুগীজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ এই এলাকা শোষণ করেছে। পরবর্তী পর্যায়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ঘাঁটি স্থাপন করেছে। আর আজ সমাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ থাবা উঁচু করেছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সোভিয়েত প্রভাব বিস্তারের পক্ষে চীন একটি বিরাট বাঁধা। আজ সোনিয়েত রাশিয়া সুয়েজখালকে আন্তর্জাতিক নৌ-চলাচলের উপযোগী করার জন্য ইসরাইলের সাথে কতিপয় অপমানজনক শর্তে আপোশ করার জন্য মিসরকে চাপ দিচ্ছে। কারণ ভূমধ্যসাগরে অবস্থানরত সোভিয়েত নৌবহর সুয়েজখালের মধ্য দিয়ে নৌপথে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পৌঁছতে চায়। অন্যদিকে এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী চীনকে কাবু করাও রাশিয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ববাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ক্ষমতার লিপ্সা এবং আঞ্চলিক সম্প্রসারণের স্পৃহাই বর্তমান চীন-রাশিয়া সীমান্ত সংঘর্ষের মূল কারণ। রাশিয়ার চেকোশ্লাভাকিয়া দখলের পরিপ্রেক্ষিতে পিকিংপন্থী একটি হংকং দৈনিকে মন্তব্য করেছিল Dog bites dog, আজ সে কথার পুনরুল্লেখ করা যায় মাত্র।

নাইজেরিয়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদের পরিণাম

বিচ্ছিন্নতাবাদী 'বায়াফ্রার' শেষ প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ার পথে। প্রধান শহরের সবগুলোই এখন নাইজিরীয় ফেডারেল বাহিনীর হাতে। ছোট্টশহর উমুয়াহিয়াকে কেন্দ্র করে 'বায়াফ্রার' ইবোরা যুদ্ধ করে যাচ্ছে। ফেডারেল বাহিনী বিচ্ছন্নতাবাদী 'বায়াফ্রার'কে বাইরের দুনিয়া থেকে পৃথক করে ফেলেছে। উমুয়াহিয়ার পার্শ্ববর্তী উলি বিমান বন্দরই এখন 'বায়াফ্রার' একমাত্র যোগাযোগ কেন্দ্র। বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত সাহায্য দ্রব্যাদি বহনকারী বিমানসমূহ এখানেই অবতরণ করে থাকে।

পূর্ব নাইজেরিয়ার সামরিক অধিনায়ক লে. কর্নেল এডুমেন্ড ওজুকু পূর্ব নাইজিরিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। বিচ্ছিন্নতাবাদী ইবোদের পক্ষ থেকে এ ভূখন্ডের নাম দেয়া হয়েছিল বায়াফ্রা। কর্নেল ওজুকু স্বাধীন বায়াফ্রার একচ্ছত্র অধিপতি হতে চেয়েছিলেন। আজ নাইজিরীয় বাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণে ওজুকুর সে স্বপ্ন প্রাসাদ ধূলায় ধ্বসে পড়েছে।

সাড়ে পাঁচ কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত নাইজিরিয়াকে আফ্রিকার বুকে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতম নজীর বলা হতো। কিন্তু কর্নেল ওজুকুর হঠকারিতা এবং উচ্চশিক্ষিত সংখ্যালঘু ইবো খ্রিষ্টানদের আত্মম্ভরিতা ও অধিক সুবিধা লাভের স্পৃহাই আজ নাইজিরয়ার বুকে গৃহযুদ্ধের অভিশাপ বহন করে এনেছে। তেইশ মাসের এই রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে আফ্রিকার সবচেয়ে সম্ভবনাময় এই দেশটি আজ শ্মশানে পরিণত হতে চলেছে। ফেডারেল নাইজিরিয়া প্রধান জেনারেল গত্তনের পক্ষ থেকে শান্তি স্থাপনের জন্য অনেকবার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু হঠকারী ওজুকু সরকার কিছু শুনতেই রাজী হয়নি। ওজুকুর এই হঠকারীতার দরুণ যুদ্ধ প্রচন্ড রূপ ধারণ করেছে। 'বায়াফ্রানরা' আজ চর্তুদিক থেকে ফেডালের বাহিনী কতৃক আটক হয়ে পড়েছে। খাদ্যাভাবে 'বায়াফ্রার' ইবোরা হাজারে হাজারে মৃত্যুবরণ করছে। ওজুকুর সরকার খাদ্যসংকট দূর করতে মোটেই সক্ষম হচ্ছে না। ফেডারেল নাইজিরিয়ায়ও খাদ্যাভাব ও পুষ্ঠিহীনতা প্রচন্ড আকারে দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে পিছু হটবার সময় 'বায়াফ্রান' ইবোরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে, যোগাযোগ মাধ্যম ধ্বংস করে ফেলছে, পানির ট্যাংকে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের নাগরিকদের পাইকারী হত্যা করছে।

আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুর দেশ নাইজিরিয়া। সাড়ে পাঁচ কোটি অধিবাসীর শতকরা বাহাত্তর জনই মুসলমান। ভৌগলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে নাইজিরিয়া উত্তর, পশ্চিম মধ্য পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে বিভক্ত। উত্তর নাইজিরিয়ার শতকরা নব্বই জনই মুসলমান। ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে নাইজিরিয়ায় দু'শ পঞ্চাশটি উপজাতির বাস। এর মধ্যে হাউসা, ফুলানী, ইরুবা ও ইবো উপজাতিই প্রধান। হাউসা ও ফুলানী গোত্রের বাস উত্তরাঞ্চলে এরা সবাই মুসলমান। ইরুবাদের বাস পশ্চিম এলাকায়। ইবোরা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। এদের অধিকাংশই পূর্ব নাইজিরিয়ায় বসবাস করে। উত্তর অঞ্চলেও কিছু খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বি রয়েছে। ফেডারেল প্রধান কর্নেল গত্তন এদেরই একজন।

পশ্চিম আফ্রিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ অনুপ্রবেশের পূর্বে দুটি স্বাধীন নাইজিরিয়ার অস্তিত্ব ছিল। উত্তরের মুসলিম নাইজিরিয়া আর দক্ষিণের পৌত্তলিক নাইজিরিয়া। ১৮০৭ সালে ব্রিটিশ দাস ব্যবসায়ীরা নাইজিরিয়ার দক্ষিণ উপকূলে আগমণ করে। ক্রমে ক্রমে তারা নাইজিরিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে উপনিবেশ স্থাপনের সুযোগ সন্ধান করতে থাকে ১৮৬১ সালের দিকে লাগোসে তাদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এ সময়ে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরা দক্ষিণের ইরো এবং ইরুবাদের প্রভাবান্বিত করে দক্ষিণ নাইজিরিয়া আশ্রিত রাজ্যের পত্তন করে। অনুরূপভাবে তারা উত্তরের হাউসা ও ফুলানী মুসলিম গোত্রদ্বয়কে জোর করে উত্তর নাইজিরিয়া আশ্রিত রাজ্যের আওতায় নিয়ে আসে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসকরা উভয় আশ্রিত রাজ্যের সমন্বয়ে 'নাইজিরিয়া প্রটেক্টরেটের' গোড়া পত্তন করে। ব্রিটিশ শাসনের গোড়াতেই ইবোরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। ফলে খ্রিস্টান মিশনারীরা ইবোদেরকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করে তোলে। ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্রীয় সকলপদ ইবোরাই দখল করতে শুরু করে দিলো। বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্র থেকেই মুসলমানরা বিতাড়িত হলো। সেনাবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোও ইবো অফিসাররাই দখল করে বসলো। ইবো খ্রিস্টানদের একচেটিয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে মুসলমানরা সেদিন সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। তারা আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন ও কেন্দ্রীয় আইনপরিষদে সমান প্রতিনিধিত্ব দাবী করে বসলো। ১৯৫১ সালের শাসনতন্ত্রে আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন স্বীকার করে নেয়া হলো। এরপর থেকেই উত্তরাঞ্চলের মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে যেতে শুরু করলো। কেন্দ্রীয় পরিষদেও তারা যথেষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠলো। ১৯৫৪ নির্বাচনে প্রখ্যাত মুসলিম নেতা আলহাজ্ব আহমাদু বেল্লোর নর্দার্ণ পিপলস্ কংগ্রেস (NPC) উত্তরোঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো। পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলে ড. নামদী আজিকার দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলো। উভয় দলের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হলো। ১৯৫৯ সালের নির্বাচনে কোন দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারলো না। ফলে আবার কোয়ালিশন সরকার গঠিত হলো। স্যার আবু বকর তাফাওয়া বালেওয়া ফেডারেল প্রধানমন্ত্রী এবং ড. আজিকা প্রেডিডেন্ট মনোনীত হলেন।

১৯৬০ সালের অক্টোবার মাসে স্বাধীনতা লাভের পর নাইজিরিয়ায় ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার কায়েম হলো। স্যার আবু বকর ফেডারেল প্রধানমন্ত্রী এবং ডা. নামদী আজিকা প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। ফেডারেল পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইবোদের একচেটিয়া আধিপত্য হ্রাস পেতে শুরু করলো। নাইজিরিয়া উত্তরের মুসলমানদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে বলে ইবোরা তখন গুজব ছড়াতে শুরু করলো। দুনিয়ার খ্রিস্টান চার্চ ও প্রেস তাদের এই মিথ্যা প্রচারণায় সাহায্য করলো। অবশেষে ১৯৬৬ সালের ১৫ই জানুয়ারি মেজর জেনারেল ইরনসীর নেতৃত্বে ইবো অফিসাররা সামরিক অভ্যুত্থান করে স্যার আবু বকর তাফাওয়ার সরকারকে উৎখাত করে ফেললো। ইবো সামরিক জান্তার হাতে স্যার আবু বকর, উত্তরাঞ্চলের প্রধনমন্ত্রী স্যার আহমাদু বেল্লো এবং পমি্চমাঞ্চলের প্রধান স্যামুয়েল আকিনতোলা নির্মমভাবে নিহত হলেন। নাইজিরিয়ার জনসাধারণ জেনারেল ইরনসীর শাসন করতে রাজী হলো না। উত্তরাঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন ধুমায়িত হয়ে উঠলো। অতঃপর ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল ইয়াকুবু গত্তন সামরিক বিপ্লবের মাধ্যমে ইরনসীর সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করলেন।

কর্নেল গত্তন ক্ষমতা দখল করেই সকল রাজবন্দীর মুক্তি দিলেন। শাসনতন্ত্র সংশোধন করার জন্যে একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন এবং সামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করার জন্য বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করলেন। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের সামরিক প্রশাসক লেঃ কর্নেল ওজুকু জেনারেল গত্তনের কর্তৃত্ব মেনে নিতে রাজী হলো না। ওজুকুর মিথ্যা প্রচারণা ও উসকানীতে নাইজিরিয়ায় দাঙ্গা শুরু হলো। এতে উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের কমপক্ষে এক হাজার অধিবাসী নিহত হলো। ইবোদের কেন্দ্র ভূমি পূর্বাঞ্চল থেকে সকল মুসলমানকে তাড়িয়ে দেয়া হলো। এতেই শেষ নয় নাইজিরিয়ায় সকল অঞ্চলের সাথে পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হলে, উত্তরাঞ্চলে কয়লা সরবরাবহ বন্ধ করে দেয়া হলো। কর্নেল ওজুকু সর্বশেষে নব্বুই লক্ষ্য ইবো অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলের স্বাধীনতা ঘোষণা করলো। বিচ্ছিন্নতাবাদী এই এলাকার নাম দেয়া হলো– বায়াফ্রা। বৃহৎ শক্তিবর্গ নাইজিরিয়ার এই ঘটনাবলির নীরব দর্শক হয়ে তামাসা দেখছিল। ফ্রান্স তো বায়াফ্রাকে স্বীকারই করে নিল এবং ওজুকুকে অস্ত্র সাহায্য দেয়া শুরু করলো। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ফেডারেল সরকারকে সমর্থন করলেও পার্লামেন্ট হ্যারল্ড উইলসনকে যথেস্ট সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ব্রিটিশ পত্র পত্রিকা 'বায়াফ্রা' এর পক্ষে ব্রিটিশ জনমত সৃষ্টির জন্য মিথ্যা প্রচারণায় মেতে উঠেছে। নাইজিরিয়ার গৃহযুদ্ধের অবসান করে শান্তি আলোচনার জন্য উইলসন গত কিছু দিন আগে লাগোস গমন করেছিলেন। কর্নেল গত্তন শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগী ও আগ্রহী হলেও কর্নেল ওজুকু এত রাজী হয়নি। অন্যদিকে সংযুক্ত চার্চ এইডের (Joint Church Aid) মাধ্যমে কর্নেল ওজুকু অস্ত্র কেনবার জন্য নানা উপায়ে পয়সা পাচ্ছে। আমেরিকা নিউজ উইক' পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী এর পরিমাণ মাসিক তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার ডলার। এই অর্থের অধিকাংশই ইউরোপের খোলা বাজারে অস্ত্র কেনায় ব্যয়িত হচ্ছে বলে উক্ত পত্রিকা স্বীকার করেছে।

আন্তর্জাতিক ইহুদীবাদ নিয়ন্ত্রিত আমেরিকা ও ইউরোপের পত্র-পত্রিকা বিচ্ছিন্নতাবাদী ইবোদের করুণ চিত্র প্রকাশ করে 'বায়াফ্রার' সমর্থনে জনমত সৃষ্টির পরিকল্পিত নীতি অনুসরণ করছে। কিন্তু বেল্লো, তাফাওয়া আর আকিনতোলা যখন সম্পূর্ণ অন্যায় ও নৃশংসভাবে নিহত হলেন তখন এই পত্রিকাসমূহ এই জঘন্য হত্যাকান্ডের নিন্দা করতেও ব্যর্থ হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যান্ডর উইলসন যিনি এই হত্যাকান্ডের কয়েক দিন পূর্বে তাফাওয়ার মেহমান ছিলেন তিনিও এই ঘটনার নিন্দা করার সৌজন্যতাবোধ করেননি।

নাইজিরিয়ায় মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষিত হলে, বেল্লো ও তাফাওয়ার সরকার দীর্ঘজীবি হলে কেবল নাইজিরিয়া নয় গোটা আফ্রিকার বুক থেকেই ইহুদী ও খ্রিস্টান সাম্রাজ্যবাদীদের হাত গুটাতে হতো। এজন্যই ঘানার প্রাক্তন নক্রুমা চক্র, ইথিওপিয়ার সেলাসী চক্র, বিশ্ব ইহুদীবাদ এবং সংযুক্ত চার্চ এতখানি তৎপর হয়ে উঠেছিল।

আলহাজ স্যার আবু বকর তাফাওয়া, বেল্লো আর নাই, নাইজিরিয়ায় আজ আগুন জ্বলছে আর রক্ত ঝরছে। আফ্রিকার হৃদয়ে কবে আবার তাফাওয়া আর বেল্লোর উত্তরসূরীরা জন্ম নেবে নির্যাতিত মুসলমানরা সে প্রতীক্ষায় দিন গুনছে।

মধ্যপ্রাচ্য: বৃহৎ চতুঃশক্তি বৈঠক

চতুঃশক্তি বৈঠক বসেছে নিউইয়র্কে। মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান বের করার জন্যই আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আলোচনার ধারাক্রম ও আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে দেখা যায় আজ পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা হয়েছে তার সবটুকুই আরব স্বার্থের পরিপন্থী। ওয়াকিফহাল মহল সূত্রে প্রকাশ, আলোচনার অন্যতম সিদ্ধান্ত হচ্ছে ইসরাইলকে একটি 'সংশোধিত সীমারেখা' (Modified frontier) পর্যন্ত সৈন্য প্রত্যাহার করে নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন কর্তৃক প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়েছিল। ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়ার প্রস্তাব ছিল ১৯৬৭ সালের ২২ শে নভেম্বর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইসরাইলকে সকল অধিকৃত এলাকা ছেড়ে দিতে হবে এবং যুদ্ধপূর্ব সীমারেখায় ফিরে যেতে হবে। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স এবং সোভিয়েত রাশিয়া উভয়ই ইঙ্গ-মার্কিন প্রস্তাবের মুকাবিলায় নিজেদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করেছে বলে পাশ্চাত্যের পত্রিকাসমূহে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। খবরে আরো জানা গেছে, এ নতুন সীমারেখা নির্ধারিত হবে ইসরাইল ও আরব রাষ্ট্রসমূহের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে। অন্যদিকে নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে প্যারিস থেকে প্রকাশিত 'ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ডট্রিবিউন' তথ্য প্রকাশ করেছে, ইসরাইলের যে পরিমাণ অধিকৃত এলাকা ছেড়ে দেবে তাকে অসামরিক অঞ্চলে পরিণত করার ইসরাইলী প্রস্তাবকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করেছে। আসল কথা, শান্তি আলোচনার নামে ইসরাইলের মুরুব্বী বৃহৎশক্তিবর্গ যে আর একটি ষড়যন্ত্রমূলক ফর্মূলা উদ্ভাবন করার প্রয়াস পাচ্ছে তা এদের কার্যকলাপের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে।

গত ২৫শে এপ্রিল স্বাধীন জাতি হিসেবে ইসরাইলের ২১ তম জন্মদিবস পালন উপলক্ষে মার্কিন কংগ্রেসের ২০৬ জন সদস্য মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছে। এতে ইসরাইলের সাথে সরাসরি শান্তি আলোচনার জন্য আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রতি একতরফা আহ্বান জানানো হয়েছে। এসোসিয়েটেড প্রেসের এক খবরে প্রকাশ বাদশাহ হোসেনের সাম্প্রতিক ব্রিটেন সফরকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন ও পররাষ্ট্র সেক্রেটারী মাইকেল স্টুয়ার্ট জর্দানী এলাকায় সকল ইসরাইল বিরোধী গেরিলা তৎপরতা বন্ধ করে দেয়ার জন্য বাদশাহর উপর চাপ দিয়েছেন। এসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একথা মনে না করে উপায় নেই যে, ১৯১৯ সালে এই বৃহৎশক্তিবর্গ মিত্র শক্তিরূপে পরাজিত জার্মানীর ওপর যেভাবে ভার্সাই চুক্তি চাপিয়ে দিয়েছিল আজ সেই একই পদ্ধতিতে তারা আরব রাষ্ট্রগুলোর ওপরও অপমানজনক সমঝোতা চুক্তি চাপিয়ে দেয়ারই ফন্দি ফিকির খুঁজছে।

ইসরাইলের মুরুব্বীরা যখন শান্তি আলোচনায় বসেছে তখন থেকেই ইসরাইলের আক্রমণাত্মক ও উসকানীমূলক কার্যকলাপ বেড়ে চলেছে। ইসবরাইল মিসর ও জর্দানের গভীর অভ্যন্তরে বিমান হামলাও পরিচালনা করেছে। মিসরের নাগাহামাদী এলাকায় ইসরাইলের সাম্প্রতিক বোমাবর্ষণ, সুয়োজখাল ও জর্দান নদী বরাবর প্রাত্যহিক গোলা বিনিময়, মুহূর্তের মধ্যে কায়রো, আম্মানও দামেশক দখল করে নেয়ার ইসরাইলী হুমকি মধ্যপ্রাচ্যে আবার যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি করেছে। ইসরাইলের মুরুব্বীরা ইসরাইলের এ ব্যাপক যুদ্ধতৎপরতার নিন্দা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যের এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে কতিপয় আরব নেতার ইসরাইলের প্রতি আপোষমূলক মনোভাব গোটা অবস্থাকেই আরব স্বার্থ বিরোধী করে তুলতে যাচ্ছে। বাদশাহ হোসেন ও প্রেসিডেন্ট নাসেরের সাম্প্রতিক বক্তৃতা-বিবৃতি ও কার্যকলাপ ইসরাইলকে অনকেখানি সাহসী করে তুলেছে। নিজেদের দোষেই আরব নেতারা আজ কূটনৈতিক পরাজয়ের সম্মুখীন। প্রেসিডেন্ট নাসের ১৯৫৬ সালে গাজা ও শার্মাল-শেখ এলাকায় জাতিসংঘ বাহিনীর অবস্থান স্বীকার করে নিয়ে ফিলিস্থিন মুক্তিবাহিনীর গেরিলা তৎপরতা পথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে আকাবা উপসাগরের নৌ-চালনার সুযোগ পেয়ে ইসরাইল ইলাত বন্দর গড়ে তোলার মওকা পেয়েছিল। আজ প্রেসিডেন্ট নাসের আবার তার অতীত বোকামীর পুনরাভিনয় করতে যাচ্ছেন। গত ফেব্রুয়ারি মাসে নিউজ উইক পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট নাসের মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনার মূলনীতি হিসেবে ৫ দফা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এতে তিনি ইসরাইলের সাথে সরাসরি আলোচনায় রাজী আছেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি আরো মত প্রকাশ করেছিলেন যে, ইসরাইল যদি সিনাই এলাকা ছেড়ে দেয় তাহলে জাতিসংঘ বাহিনী মোতায়েনেও তিনি রাজী আছেন। ফিলিস্থিনি মজলুম মুসলমানের জন্য তার কেবল একটি দাবীই ছিল আর তাহলো ফিলিস্থিনি মুহাজির সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান। গত এপ্রিলের ০ তারিখে বাদশাহ হোসেন ওয়াশিংটনের জাতীয় প্রেস ক্লাসে মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিরসনে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দান আকাবা ও সুয়েজে নৌ-চলাচলের অধিকারের স্বীকৃতিসহ যে ৬ দফা শান্তি প্রস্তাব পেশ করেছেন তাও মূলতঃ প্রেসিডেন্ট নাসেরের ৫ দফারই ব্লু প্রিন্ট। প্রেসিডেন্ট নাসের হোসেনের ৬ দফা প্রস্তাবকে খোলাখুলি সমর্থনও করেছেন। আরব জনগণ হোসনে নাসেরের এ প্রস্তাব সমর্থন করেনি। ফিলিস্থিন মুক্তিসংস্থার ৫টি দল সরাসরি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। মন্তব্য প্রসঙ্গে আল-ফাতাহ ঘাষণা করেছে, 'মিসর ও

জর্দান ফিলিস্থিনের মুহাজিরদেরকেই সমঝোতার মূল্য দিতে বাধ্য করতে চাচ্ছে।' একমাত্র লেবানন ছাড়া কোন আরব রাষ্ট্রই এ প্রস্তাব সমর্থন করেনি। ইরাক ও আলজিরিয়া এ প্রস্তাবকে সাম্রাজ্যবাদীদের আর একটি ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেছে। সৌদি আরব ও কুয়েত এই পরাজিত মানসিকতার কঠোর সমালোচনা করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জুন যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ মিসর ও জর্দানের প্রধান সাহায্যকারী হচ্ছে সৌদি আরব ও কুয়েত।

গত জুন যুদ্ধের পর খার্তুমে অনুষ্ঠিত আরব রাষ্ট্র সম্মেলনে স্থির হয়েছিল: ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না, আকাবা উপসাগর ও সুয়েজ-খালে ইসরাইলকে নৌ-চালনার অধিকার দেয়া হবে না, ঐক্যবদ্ধ সামরিক শক্তির মাধ্যমে আরবভূমি থেকে ইসরাইলকে উৎখাত করে ফেলা হবে। কিন্তু গত দু'বছরে এ সিদ্ধান্তের কোনটিই কার্যকরী করার চেষ্টা করা হয়নি। এমনকি একটি আরবা শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করা হয়নি। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি টালবাহানা ছিল প্রেসিডেন্ট নাসেরের। কারণ তার মুরুব্বী সোভিয়েত রাশিয়ার এজাজত মিলেনি। আর একথাতো সবাই জানে যে, সোভিয়েত রাশিয়া ইসরাইলের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। ইসরাইল বিরোধী কোন পদক্ষেপ রাশিয়া নীতিগতভাবে সহ্য করতে পারে না। ফিলিস্থিনি গেরিলারা মরণপণ লড়ছে। আল-ফাতাহ, গেরিলাদের এই মুক্তিযুদ্ধ বন্ধ করার ফর্মুলা আবিষ্কার করার জন্যই মূলতঃ চতুঃশক্তি বৈঠক। অন্ততঃ এ পর্যন্ত তাদের পক্ষপাতমূলক ভূমিকা তো তাই সাক্ষ্য দেয়। কারণ এরাই সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইসরাইলী কমান্ডোবাহীনি যখন আরব মুসলমানদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা ও বিতাড়িত করছিল তখন শান্তির এই অগ্রদূতদের কণ্ঠ নীরব ছিল। এদেরই সহায়তায় ১৯৫৬ সালে ইসরাইল আরব রাষ্ট্রসমূহকে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করেছিল। এদেরই ষড়যন্ত্রের ফলে ১৯৬৭ সালের ২২শে নভেম্বর জাতিসংঘ প্রস্তাবের মাধ্যমে ইসরাইলকে ফিলিস্থিন বিভক্তি করণ পরিকল্পনার চেয়ে আরো এক-তৃতীয়াংশ ভূখন্ড বেশি প্রদানের কথা মেনে নেয়া হয়। কিন্তু এতেও ইসরাইলের মন ওঠেনি। ইসরাইল নিরাপত্তা পরিষদের সে সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। ইসরাইলকে আমেরিকা দিয়েছে ফ্রান্টম, ফ্রান্স দিয়েছে মিরেজ বিমান। আমেরিকা ও ফ্রান্সের সহায়তায়ই ইসরাইল পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হতে যাচ্ছে। কতিপয় আরব রাষ্ট্রের বন্ধু বলে পরিচয় দিলেও রাশিয়া যে আরবদের সঙ্গীন মুহূর্তে পিঠটান দেবে একথা গত জুন যুদ্ধেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। বৃহৎ শক্তিবর্গের পরোক্ষ সহযোগিতা এবং আরব রাষ্ট্রপ্রধানদের দুর্বলতা ইসরাইলের সাহস অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। বাদশাহ্ হোসেনের ৬ দফা পস্তাবের ওপর মন্তব্য প্রসঙ্গে ইসরাইলী উজিরে আজম মিসেস গোল্ডা মায়ার পার্লামেন্টে বলেছেন, কেউই ইসরাইলকে ১৯৬৭ সালের ১ লা জুনের অবস্থানে নিয়ে যেতে পারবে না। বৃহৎ শক্তিবর্গের কোন সিদ্ধান্ত ইসরাইল মানতে বাধ্য নয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদকে মার্কিন প্রভাবিত চতুঃশক্তি সম্মেলনে মার্কিনী প্রস্তাবই গৃহীত হচ্ছে, একথা ইতোমধ্যেই খোলাসা হয়ে গেছে। গত ২৬শে মার্চের 'টাইমস্'-এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের রক্ষণশীল দলীয় সদস্য স্যার টার্ফটন ব্রিটিশ আমেরিকার ইসরাইল নীতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে 'Israel right or wrong'. চতুঃশক্তি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত তাই আরব স্বার্থের অনুকূল হবে একথা আশা করা আজ অনেকটা দুরাশার সামিল হয়েছে।

দ্যাগলের পতন:
ফরাসী ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি

গত ২৮শে এপ্রিল ফরাসী প্রেসিডেন্ট জেনারেল দ্যগল পদত্যাগ করছেন। দ্যগলের পদত্যাগের সাথে সাথে ইউরোপের ইতিহাসেরও একটি অধ্যায় শেষ হয়েছে। ফ্যান্সের শাসনপদ্ধতি এবং সিনেট সংস্কারের উপর অনুষ্ঠিত ২৭শে এপ্রিলের গণভোটে পরাজিত হয়েই দ্যগল পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২৮ শে এপ্রিল মধ্যরাতে মাত্র তিন লাইনের একটি বিবৃতিতে ৭৯ বৎসর বয়স্ক জেনারেল তার পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেছেন। দ্যগলের পরাজয়ে দ্যগল বিরোধী যুবকেরা প্যারিসের রাজপথে আনন্দোৎসব করতে থাকে। জেনারেল দ্যগলের আকস্মিক পদত্যাগে দেশবিদেশের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দ্যগল বিরোধীরাও তার পদত্যাগে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। যে ব্রিটেনকে জেনারেল দ্যাগল ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে প্রবেশ করতে দেননি সেই ব্রিটেনের পত্রপত্রিকাও তার পদত্যাগে দুঃখ প্রকাশ করেছে। ১৯৫৮ সালে দ্যগল ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট হিসেবে পঞ্চম ফরাসী প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টির করেন। এই ১১ বছরের শাসনকালে ফ্রান্সে মোট পাঁচটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ২৭ শে এপ্রিলের গণভোট ছিল দ্যগল শাসনের ৫ম গণভোট। দ্যগল এটাকে শেষ পর্যন্ত আস্থাভোট মনে করেন। দ্যগলের এই ১১ বছর শাসনকালে গত বছরের প্রচন্ড ছাত্র ও শ্রমিক অসন্তোষই ছিল সবচেয়ে গুরুতর আভ্যন্তরীণ সংকট। দ্যাগল এ সংকট কাটিয়ে উঠেছিলেন সত্য, কিন্তু এটাই তার জনপ্রিয়তা কমিয়ে দিয়েছিল অনেকখানি। ক্ষয়িষ্ণু এই জনপ্রিয়তার মুখে জেনারেল দ্যগল যখন জনগণের অবস্থা জানতে চেয়েছিলেন তখন ২ কোটি ৯০ লক্ষ ভোটারের শতকরা ৫৩ জনই তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে।

জেনারেল দ্যগল স্বদেশের শাসন ব্যাপারে যেরূপ স্বৈরাচারী ছিলেন আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রেও সেরূপ স্বাধীন মতাবলম্বী ও একরোখা ছিলেন। গত বছর নভেম্বরে ফ্রান্সের চরম মুদ্রা সংকটের সময় ফ্রান্সের মুদ্রামান হ্রাস করার জন্য তাঁকে চাপ দেয়া হলে তিনি তা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। দ্যগলের এই স্বৈরাচারী ও স্বাধীন রাজনীতির পেছনে তাঁর ব্যক্তি প্রভাব প্রতিষ্ঠাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। তাঁর ধারণা ছিল প্রতিটি ফরাসীই গলবাদের অনুসারী হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নিজেকে সুপ্রিরিয়র প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁকে অনেকবারই বিরাট রকমের ঝুঁকি নিতে হয়েছে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে চার্লস দ্যগলের উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা এবং পশ্চিম ইউরোপের প্রতিরক্ষা জোট ন্যাটোর সামরিক কাঠামো থেকে ফ্রান্সের সেনাবাহিনী প্রত্যাহার। দ্যগল ভিয়েতনামে আমেরিকার অন্যায় নীতি সমর্থন করেননি। চরমপন্থীদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি আলজিরিয়ার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মেনে নিয়েছিলেন। শাসনকারের প্রথম দিকে অবশ্য দ্যগল সরকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইসরাইলকে সাহায্য করতেন। পরে ইহুদীদের সম্প্রসারণবাদী একগুঁয়ে মনোভাব তাঁকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। তিনি ইসরাইলের সম্প্রসারণবাদী মনোভাব ও আক্রমনাত্মক নীতির তীব্র নিন্দা করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ইসরাইলের কাছে ফরাসী অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। গণভোটে দ্যগলের পরাজয়ের এ ছিল একটি অন্যতম কারণ। এ জন্যই বিরাট সংখ্যক ইহুদী ভোটার দ্যগলের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল। জেনারেল দ্যগল বিচ্ছিন্নতাবাদী 'বায়াফ্রাকে' স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। আফ্রিকার বুকে ফরাসী প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল তার উদ্দেশ্য। পশ্চিম জার্মানির সাথে ফ্রান্সের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে স্থাপনের পেছনে চার্লস দ্যাগলের দান ছিল সবচেয়ে বেশি। এর ফলে শতাব্দীকালের ফ্রাঙ্কো-জার্মান বিরোধের অবসান হয়েছিল।

রাজনীতিবিদ হিসেবে দ্যগল ছিলেন নির্ভীক। তিনি একই সাথে সমাজতন্ত্র ও আমেরিকান পুঁজিবাদকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করতেন না। তিনি যেমন আমেরিকার ভিয়েতনাম নীতিকে সমর্থন করেননি তেমনি রাশিয়ার চেকোশ্লোভাকিয়া দখলেরও কঠোর সমালোচনা করেছেন। গত বছর মে মাসে সমাজতন্ত্রী দেশ রুমানিয়ার বুকে দাঁড়িয়ে তিনি পূর্ব ইউরোপের বুক থেকে সমাজতন্ত্রের লৌহকপাট অপসারণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কানাডা সফরকালে তিনি কুইবেকের স্বাধীনতা দাবী করেছিলেন, যা কানাডা সরকারকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। চার্লস দ্যগলের এই সাঁড়াশী অভিযান সম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী দলপতিদেরকে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষেপিয়ে তুলেছিল।
দ্যগলের পতনের অনেক কারণই থাকতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ এই যে, ফ্রান্সের গণতন্ত্রীকামী মানুষ দ্যগলের ব্যক্তি শাসন আর বরদাশত করতে রাজী ছিল না, তা তিনি যতবড় ব্যক্তিত্ব আর অনন্য প্রতিভাই হোক না কেন। দুনিয়ার বহু বড় ডিক্টেটরের কপালে যা জুটেছে আজ দ্যগলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। একথা সত্য যে, চার্লস দ্যগল ফ্রান্সের ত্রাণকর্তা ছিলেন। একথাও সত্য যে, ফরাসী ইতিহাসের দীর্ঘ ৩০ বছরে তিনি ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। কিন্তু রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি এ্যাডভেঞ্চারিজম নীতির অনুসারী ছিলেন। তাঁর পতনের এটাও একটা কারণ ছিল।

জেনারেল দ্যগল ক্ষমতা ত্যাগ করেছেন! ফরাসী শাসনতন্ত্র অনুযায়ী দ্যাগল মন্ত্রীসভা এখনও কাজ করে যাচ্ছে। সিনেট প্রেসিডেন্ট মি. এলান পোহার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে এলিসি প্রসাদে প্রবেশ করেছেন। ফরাসী শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের এক মাসের মধ্যেই নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে হবে।

চার্লস দ্যাগলের আকস্মিক পদত্যাগ ফ্রান্সের রাজনৈতিক ইতিহাসে গভীর শূণ্যতা ও কঠিন সংকটের শূচনা করেছে। ফ্রান্সের রক্ষণশীল পত্রিকা 'লা ফি গারো' মন্তব্য করেছে, 'আমাদের ভুললে চলবে না যে, যুদ্ধ আমাদের প্রতীক্ষা করছে।' 'লা ফি গারোর' কথিত এ যুদ্ধ হচ্ছে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আর এ দ্বন্দ্ব হচ্ছে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী রাজনীতির। চার্লস দ্যাগল ফ্রান্সে গলবাদের জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিলো ইউরোপের বুকে এক নতুন ধনবাদী জাতীয়তার সৃষ্টি। তাঁর শ্লোগান ছিল 'Unite Europe, unite.' এজন্যই তিনি ইউরোপের বুক থেকে আমেরিকা ও রাশিয়ার সামরিক ঘাঁটিসমূহের অপসারণ দাবী করেছিলেন, সমাজবাদী ও ধনবাদী দুই ইউরোপীয় ঐক্যসংস্থাকে জোড়া দিতে চেয়েছিলেন। এজন্যই সমাজবাদী দেশ রুমানিয়ার বুকে দাঁড়িয়ে সমাজতন্ত্রের লৌহ যবনিকা সরিয়ে ফেলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ধনবাদী জাতীয়তার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের স্বপ্নই রূপলাভ করেছিল গলবাদের মধ্যে। জেনারেল দ্যগলের পর গলপন্থী ও গণবিরোধীদের মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে, যা ফ্রান্সকে দ্যাগলপূর্ব যুগের স্থিতিহীনতা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারে।

নুতন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সের সব কটি রাজনৈতিক দলই তৎপর হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে রয়েছে দ্যগল পন্থীরা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিপাবলিকান পার্টি, রনমপন্থী সমাজতন্ত্রী, কনভেনশন অব রিপাবলিকান ইনস্টিটিউশন, মধ্যপন্থী গণতন্ত্রী ও কম্যুনিস্ট পার্টি। এছাড়া এ নির্বাচনে রক্ষণশীলদল, স্বতন্ত্রদল ও উদারনৈতিক র‍্যাডিক্যাল সোশালিস্ট পার্টিরও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা থাকবে। দ্যগল পন্থীদের বিরুদ্ধে বহুধা বিভক্ত সমাজতন্ত্রী শিবিরে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা চলছে। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে এ পর্যন্ত দ্যগল পন্থী সাবেক প্রধানমন্ত্রী জর্জ পাম্পডু, মার্সেলিজের সমাজতন্ত্রী মেয়র গ্যাস্টন ডেফারী ও মধ্যপন্থী অস্থায়ী প্রেডিডেন্ট এল্যান পোহারের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

ফ্রান্সের নির্বাচন ১লা জুন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অথবা নির্বাচনোত্তর ফ্রান্সে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে একটি চূড়ান্ত রাজনৈতিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা রয়েছে। এ সংঘর্ষে কারা জয়ী হবে বলা মুশকিল। তবে আধুনিক গণতন্ত্রের জন্মভূমি ফ্রান্সের জনগণ যে সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ববাদকে সমর্থন করবে এটা নিশ্চিৎ করে বলা যায়। জেনারেল দ্যগল ফ্রান্সে নতুন জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করেছিলেন, এর উপনিবেশতার সংস্কার করেছেন এবং ফ্রান্সকে বৃহৎ শক্তির পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আজ একথা বলতেই হয় যে, তিনি ফ্রান্সকে এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে পরিত্যাগ করেছেন। গত ১১ বছরে দ্যগলের ব্যক্তি শাসন সমালোচনার প্রশ্রয় দেয়নি– গঠনমূলক নেতৃত্ব সৃষ্টি করেনি। স্থিতিহীনতা ও রাজনৈতিক গোলযোগের মুখে দ্যগল ফ্রান্সের ক্ষমতা হাতে নিয়েছিলেন। দীর্ঘ ১১ বছর পর ফ্রান্সকে আবার সেই অবস্থায়ই পরিত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন। ব্যক্তিকেন্দ্রীক ও আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিণতি এভাবেই হয়ে থাকে। ইতিহাসের শিক্ষা এই-ই।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি

গত কিছুদিন থেকে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিয়ে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 'নিরাপত্তা' 'যৌথ রক্ষাব্যবস্থা', 'আঞ্চলিক সহযোগিতা', 'অর্থনৈতিক সহযোগিতা' ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক বাজার সরগরম হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ভবিষ্যত নিয়ে মাথা ঘামানোটা সোভিয়েত রাশিয়ারই অধিক। কিছুদিন আগে সোভিয়েত রাশিয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যতম রাষ্ট্র ভারতকে সামরিক ছত্রছায়া দিতে চেয়েছিল। গত ৭ই জুন মস্কোতে অনুষ্ঠিত কম্যুনিস্ট সম্মেলনে সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল লিওনিদ ব্রেজনেভ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নিরাপত্তার জন্য একটি যৌথ রক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। এর প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুলে রাশিয়া, ভারত, ইরান, পাকিস্তান ও আফগানিস্থানের একটি সম্মেলনের প্রস্তাবও সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। প্রথম দিকে এই নব এশীয় জোটের কোনো ব্যাখ্যাই সোভিয়েতপক্ষ থেকে দেয়া হয়নি। অবশ্য ইদানিং এ.পি.এন-এর ভাষ্যকার স্পার্টাক বেগলফ প্রস্তাবিত এশীয় যৌথ নিরাপত্তা চুক্তির ৬ দফা মূলনীতি ব্যাখ্যা করেছেন। এ থেকে মনে হয় প্রস্তাবিত দেশসমূহের সাথে গোপন আলোচনা অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। পাকিস্তান এধরনের কোন জোটে যোগ দেবে না বলে পররাষ্ট্র দফতর থেকে ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত রক্ষাজোটের পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি। তবে পর্যবেক্ষকদের অনেকেরই ধারণা, এশীয় প্রতিরক্ষা জোটের প্রস্তাবটি কেবল সোভিয়েত রাশিয়ার নয় বরং এ একটি রুশ-মার্কিন ষড়যন্ত্র। এ ধারণার উপর বিশ্বাস স্থাপনের কারণও আছে প্রচুর। বর্তমান আন্তর্জাতিক স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া ভাগাভাগি নীতিতে বিশ্বাসী। এটাকেই এরা বলে থাকেন 'শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান' (Peaceful Co-existence)। এই 'শান্তিপূর্ণ অবস্থানের' নীতিই তারা প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন মধ্যপ্রাচ্যে। আর এশিযায় কম্যুনিস্ট চীনের মোকাবিলা করার জন্য রাশিয়া আমেরিকা নিজেদের মধ্যে সহ-অবস্থান নীতির আড়ালে একটা আঁতাত সৃষ্টি করেছে। যার অভিব্যক্তিই এইব্রেজনেভ পরিকল্পনা। কিছুদিন পূর্বে টোকিওতে অনুষ্ঠিত প্রশান্ত মহাসগারীয় দেশেসমূহের কাউন্সিল সভায় জাপান 'প্রমান্ত মহাসাগরীয় এশিয়া গঠনের এক প্রস্তাব দিয়েছিল। এ প্রস্তাবের পেছনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইঙ্গিত স্পষ্ট। অন্যদিকে আমেরিকার অন্যতম বন্ধুরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও ভারতকে নিয়ে এশিয়ার নিরাপত্তার জন্য 'এশীয় ত্রিভূজ' (Asian triangle) রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং দূরপ্রাচ্যের 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে 'সামরিক ছত্রছায়া' দানই নাকি এর উদ্দেশ্য। এসব থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেপথ্য ষড়যন্ত্রের কথা স্পষ্টই বুঝা যায়। তবে এসমস্ত ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে মার্কিনীরা এখনও সামনে আসেনি। এর কারণ ভিয়েতনাম কেলেঙ্কারীর ফলে বাহির্বিশ্বে আমেরিকার মর্যাদা অনেককানি ক্ষুণ্ন হয়েছে। নিজের দেশেও তাদের যথেষ্ট সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমেরিকা তাই এখন পর্যন্তও সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে দ্বিপাক্ষিক আঁতাত ও তাবেদার রাষ্ট্রসমূহের মাধ্যমে এশিয়ায় নিজের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাকার চেষ্টা করছে।
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যে নিজের স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্য ব্রিটেনও রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। ১৯৭১ সালে বিদেশ থেকে ব্রিটিশ সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টি নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও তুমুল বাকবিতন্ডা সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রতি ব্রিটিশ পত্রিকা 'ডেইলী টেলিগ্রাফ' এ প্রকাশিত এক নিবন্ধে একথা পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, 'বিদেশে-ব্রিটিশ অবস্থান আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের সাহায্য করতে সক্ষম হবে এবং তাদের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আনতে পারবে। এছাড়া যে বিশ্বব্যাপী বানিজ্য ব্যবস্থার উপর ব্রিটেনের অর্থনীতি নির্ভর করে, তার নিরাপত্তা বিধানে এবং উন্নয়নে সাহায্য করবে।' রাশিয়ার তৎপরতার প্রতি ইঙ্গিত করে পত্রিকাটি আরো বলেছে, 'রুশ জাহাজসমূহ ভূমধ্যসাগর, উত্তর আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থান করছে। শ্রীঘ্রই তারা পারস্য উপসাগর এবং ভারতমহাসগারেও শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তুলবে। একটি ব্যবসায়ী জাতি হিসেবে ব্রিটিনেরে সমস্ত শক্তি দিয়ে ব্রিটিশ বাণিজ্যপথ বন্ধ করে দেয়ার রুশ ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করা উচিত। আর একথা সত্য যে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনুপ্রবেশের অগ্রপদক্ষেপ ছাড়াও রুশ নৌবহর এ অঞ্চলে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।'

১৯৭০ সালের পরে দক্ষিণ পুর্ব এশিয়া থেকে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ শুরু হবে। সৈন্য প্রত্যাহার সম্পূর্ণ হতে আরো ৩০ মাস বাকী। ইতোমধ্যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য ব্রিটেনের নেতৃত্বে ক্যানবেরায় পঞ্চজাতি শীর্ষসম্মেলনও হয়ে গেছে। সৈন্য প্রত্যাহার শেষ হওয়ার পূর্বেই ব্রিটেনকে এ অঞ্চলে তার স্বার্থ সংরক্ষণের নতুন ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে হবে।

'এশিয়ার যৌথ রক্ষাব্যবস্থার' পরিকল্পনা ঘোষিত হবার পর কম্যুনিস্ট চীনে এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া পলিক্ষিত হয়। পিকিং রেডিও এবং পিপলস ডেইলী এ পরিকল্পনাকে চীনের চতুর্দিকে 'বেষ্টনী রচনা' বলে মন্তব্য করে। বস্তুতঃ চীন এটা ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছে যে,

যৌথ রক্ষা ব্যবস্থার নামে রাশিয়া এবং মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চীনকে কোণঠাসা করতে চাচ্ছে। এজন্যই কম্যুনিস্ট চীন বন্ধুরাষ্ট্রসমূহে বিনামূল্যে অস্ত্র সরবরাহের কথাও ঘোষণা করেছে।

ভূগোলের মাপকাঠিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বলতে ফরমোজা, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বেডিয়া, তাইল্যান্ড হয়ে বার্মা পর্যন্ত বুঝায়। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় পাকিস্তান, ভারত ও সিংহলকে এ অঞ্চলেই ধরা হচ্ছে। দুনিয়ার অনুন্নত অঞ্চলসমূহের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অন্যতম। এই এলাকার উন্নতমানের কৃষিজাত কাঁচামাল, মূল্যবান কনিজসম্পদ ও নৌ-বাণিজ্যের ব্যাপক সুবিধা উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহকে বারবার এই অঞ্চলে আকৃষ্ট করেছে। জনগণের নিরক্ষরতা, দারিদ্র এবং উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহকে বারবর এই অঞ্চলে আকৃষ্ট করেছে। জনগণের নিরক্ষরতা, দারিদ্র এবং আভ্যন্ড়রীণ কোন্দলের সুযোগ নিয়ে বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকালে স্পেনীয়, পর্তুগীজ, দিনেমার আর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা এখানে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা বিশ্বর সমাজতন্ত্রী ও পুঁজিবাদীদের নেতৃত্বে নয়া উপনিবেশবাদ গড়ে ওঠে। অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য এবং রাজনৈতিক গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে পুঁজিবাদী এবং সমাজতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিভূ আমেরিকা ও রাশিয়া এই অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে। চীন প্রথমদিকে তামাসা দেখলেও পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ শুরু করে। এই তিন বৃহৎ শক্তির তৎপরতা এবং রাজনৈতিক স্বার্থের উপরই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভবিষ্যত নির্ধারিত হচ্ছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটিসমূহ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে। এ মার্কিন ঘাঁটিসমহের সংখ্যা ২ হাজারেরও অধিক। এর বৃহত্তম ঘাঁটির অধিকাংশই জাপান প্রশান্ত মহাসগারীয় দ্বীপ ওকনাওয়াতে অবস্থিত। জাপানের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় আমেরিকার কমপক্ষে ২০টি বিমান ঘাঁটি ও ১০০টি বিমান বন্দর রয়েছে। সমস্ত ঘাঁটিতে প্রায় ৩০ হাজার মার্কিন অফিসার কাজ করছে, এছাড়া প্রায় প্রতিটি জাপানী বন্দরেই মার্কিন নৌ-ঘাটি রয়েছে। সমগ্র এশিয়ায় ওকিনাওয়া হচ্ছে– মার্কিনীদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহৎ সামরিক ঘাঁটি। এখানে তাদের ৩০টি বিমান ঘাঁটি এবং ৫০ হাজার সামরিক অফিসার কাজ করছে। ওকিনাওয়ার নাহা শহর আমেরিকার বৃহত্তম নৌ-ঘাঁটি। এখানে তাদের নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের ৮টি ঘাঁটি অবস্থিত। ওকিনাওয়া ঘাঁটি থেকে আমেরিকানরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও দূর প্রাচ্যের যে কোন দেশে ওপর নৌ ও বিমান হামলা চালাতে পারে। সম্প্রতি আণবিক অস্ত্রেও তারা এ ঘাঁটিটিকে মজবুত করে তুলছে।

ফিলিপাইনে আমেরিকার ২৩টি সামরিক ঘাঁটি ও ১০ হাজারের এক সমারিক বাহিনী অবস্থান করছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামে ২১টি বিমান খাঁটি, ৫০টি বিমান বন্দর এবং ৬টি মার্কিন নৌ-ঘাঁটি রয়েছে। এছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহরে ১৭৫টি যুদ্ধজাহাজ, ৭০০ খানা জঙ্গী বিমান ও ৮০ হাজারের এক সামরিক বাহিনী রয়েছে। দূর প্রাচ্যে ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সর্বমোট আমেরিকান সৈন্য সংখ্যা ৮ লক্ষ ৪৭ হাজার। এই ব্যাপক সামরিক অবস্থানের মাধ্যমে আমেরিকা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বুকে এমন একটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে চায় যার বিস্তৃতি হবে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ান থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ড পর্যন্ত। বাহ্যতঃ স্বাধীন হলেও এসকল রাষ্ট্র মূলতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

আধুনিক বিশ্বের দ্বিতীয় ঔপনিবেশিক শক্তি সোভিয়েত রাশিয়া নিজস্ব স্বার্থোদ্ধারের পরিকল্পনা নিয়েই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কতিপয় প্রভাবান্বিত এলাকা তৈরির চেষ্টা করে আসছে। অন্যদিকে রুশ-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের পর চীনের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এজন্যই রাশিয়া ভিয়েতনামে আমেরিকানদের সাথে সন্ধি করে নিয়েছে, এবং এশীয় প্রতিরক্ষা জোট গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। অন্যদিকে ভারত মহাসাগরে ভারতীয় নৌবহরকে শক্তিশালী করে রাশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পরোক্ষ প্রবাব বিস্তারেরও চেষ্টা করছে। এজন্যই ব্রেজনেভ পরিকল্পিত রক্ষাজোট ভারতের যোগদান করা উচিত বলে সোভিয়েত সরকারী পত্রিকা ইজভেস্তিয়া মন্তব্য করেছে।

রাশিয়া ভারত মহাসাগরে ইতোমধ্যেই ১৪টি সুসজ্জিত যুদ্ধজাহাজের একটি নৌবহর গঠন করে ফেলেছে। এই নৌবহরের জন্য রাশিয়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত ভারতীয় নৌঘাঁটিসমূহ ব্যবহারেরও অধিকার লাভ করেছে। এর ফলে সোভিয়েত রাশিয়া মালাক্কা প্রণালী ও বঙ্গোপসাগরীয় এলাকায় প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। লন্ডনের 'ইনিসটিটিউট ফর স্ট্যাটেজিক রিসার্চ' কর্তৃক ৫ই জুনে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ভারত রাশিয়াকে ভিজাগাপট্টম সাবমেরিন ঘাঁটি, বোম্বাই, কোচিন, মরমুগোয়া ও পোর্ট ব্লেয়ারসহ বেশ কয়েকটি বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের খবরে প্রকাশ, রাশিয়া তার ভারত মহাসাগরীয় নৌবহর মজবুত করার জন্য মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরেও নৌঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করছে। একটি মার্কিন পত্রিকার বরাত দিয়ে নয়াচীন বার্তা সংস্থা তথ্য প্রকাশ করেছে, সোভিয়েত রাশিয়া ভারত মহাসাগরকে রকেট পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তারের জন্য রাশিয়া ভারতকে ব্যবহার করতে চাচ্ছে। এজন্য ১৯৬০-৬৭ সালে রাশিয়া ভারতকে প্রায়

৯০ কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে। রাশিয়া ভারতীয় নৌবহরকে শক্তিশালী করার জন্য ৩টি 'এফ' শ্রেণীর সর্বাধুনিক সাবমেরিন, ৬টি হালকা ফ্রিগেট, ৬টি প্যাট্রোল বোট ও ২৪টি আধুনিক যুদ্ধজাহাজ দিয়েছে। বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত ভিজাগাপট্টম নৌঘাঁটির অংশ হিসেবে রাশিয়া সেখানে একটি সাবমেরিন ঘাঁটি নির্মাণ করছে।

রাশিয়া এভাবে কৃষ্ণ সাগর থেকে পারস্য উপসাগর হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এক বিরাট নৌবহর গড়ে তুলতে প্রয়াসী।
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চীনের স্বার্থ সর্বাধিক। এছাড়া চীনের নিজস্ব প্রতিরক্ষার প্রশ্নটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু রুশ-মার্কিন নৌবহরের সাথে প্রতিদ্বন্দীতা করার মত নৌশক্তি চীনের নেই। চীনের বিমান বাহিনীও মজবুত নয়। তবু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে চীনের হস্তক্ষেপ কোন অংশেই কম নয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রে অবস্থানকারী চীনা বংশোদ্ভূত জনসমষ্টি কোন না কোন বিভ্রাট বাধাচ্ছেই। বিভিন্ন দেশে চীনা জনগোষ্ঠী দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়েছে আর চীন তাদেরকে আরো উত্তেজিত করেছে। বার্মা, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া এই চীনা পঞ্চম বাহিনীরই শিকারে পরিণত হয়েছে। ১৯৬৬ সালে ইন্দোনেশিয়ায় ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং পরবর্তী পর্যায়ে ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান চীনা জনসমষ্টির পঞ্চমবাহিনীতুল্য কার্যকলাপেরই ফল। গত বছর মাওসেতুংয়ের ছবি ও পুস্তিকা বিলি নিয়ে বার্মার রাজধানী রেঙ্গুনে স্থানীয় জন সাধারণের সাথে চীনাদের রক্ষক্ষয়ী সংঘর্ষের সূচনা হয়। আর অতিসম্প্রতি মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত রক্ষক্ষয়ী দাঙ্গার পেছনে চীনের উস্কানীমূলক তৎপরতা অনেকখানি দায়ী। অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনুন্নত দেশসমূহের আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ও বেআইনী গেরিলা তৎপরতাকে চীন সব সময়ই উৎসাহ দিয়ে এসেছে। তথাকথিত 'গণযুদ্ধের' মাধ্যমে এসকল রাষ্ট্রকে 'মুক্ত' করার জন্য চীন গেরিলাদের প্রতি অন্যায় ও অবৈধ আহ্বান জানিয়ে এসেছে।

এবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিজস্ব অবস্থার কথা চিন্তা করা যাক। এ অঞ্চলে জনশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদের দিক দিয়ে ভারত অন্যতম। ১৯৭১ সালে সুয়েজের পূর্বাঞ্চল থেকে বিটিশ সৈন্য অপসারণের পর ভারত মহাসগারীয় এলাকায় যে শক্তি শূন্যতার সৃষ্টি হবে ভারত তার সুযোগ নেয়ার জন্য ব্যাপকহারে নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন অনাহারে মরছে ভারত তখন কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করছে।১৯৬৯-৭০ সালে ভারতের প্রতিরক্ষা বাজেট ১৪৮ কোটি ডলার। গত বছরের চেয়ে আরো ৮ কোটি ডলার বেশি। আমেরিকান বার্তা সংস্থার খবরে প্রকাশ, ভারত ৪ কোটি ডলার ব্যয়ে দুটি নৌবহর গড়ে তুলেছে। এর একটি অবস্থান করবে বঙ্গোপসাগরে অন্যটি আরব সাগরে। জাপান ও রাশিয়ার সহযোগিতায় ভিজাগাপট্টমের নৌঘাঁটিকে শক্তিশালী করছে এবং একটি সবমেরিন ঘাঁটিও নির্মাণ করছে। রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় ভারত বিমান বাহিনী সম্প্রসারিত ও আধুনিকীকরণ করেছে। ভারতীয় বিমান বাহিনী এখনই ৭ শত জঙ্গী বিমানের অধিকারী। আণবিক অস্ত্রে শক্তিশালী হওয়ার জন্য ভারত ৬টি আণবিক শক্তিকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে। ইতঃপূর্বে প্রতিষ্ঠিত ৩টি আণবিক গবেষণা চুল্লী থেকে প্লুটোনিয়াম উৎপাদিত হচ্ছে। ভারত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের কাছ থেকেই প্রচুর অস্ত্র সাহায্য পাচ্ছে। বোমাবর্ষণকারী বিমান ও রুশ ক্ষেপণাস্ত্র লাভেরও প্রতিশ্রুতি পেয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো আজ সমাজতন্ত্রী ও পুঁজিবাদী দুনিয়ার ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের রণক্ষেত্রে পরিণত হতে চলেছে। বৃহৎ শক্তিবর্গের সহায়তায় এর অভ্যন্তরে আবার নয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উদ্ভব হচ্ছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাগ্য নিয়ে আজ বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে যে টানা হেঁচড়ার সৃষ্টি হয়েছে প্রবাবিত ও তাবেদার এলাকা গঠন এর অন্যতম লক্ষ্য। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত এশিয়ার বুকে কম্যুনিস্ট ও পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী সাম্রাজ্যবাদের রণক্ষেত্রে ছিল কোরিয়া। '৫৪ সালের পর ভিয়েতনাম তাদের নতুন ফ্রন্টে পরিণত হলো। নিউওয়ে দ্বীপে থিউ-কিম্পন শীর্ষসম্পেলন এবং প্যারিস শান্তি বৈঠকের ফল আজ ভিতেনামে 'কোরিয়া টাইপ' শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এশিয়ার বুকে নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখতে হলে তাদেরকে আর একটি কোরিয়া অথবা ভিয়েতনামের সৃস্টি করতে হবে। এই নতুন ফ্রন্টের অবস্থান নিয়েই আজ মস্কো, পিকিং ও ওয়াশিংটনে জল্পনা চলছে।

ধর্ম ও আধুনিক চিন্তাধারা

(শহীদ আবদুল মালেক অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্র থাকাকালে এ প্রবন্ধটি লেখেন। কিন্তু কোনো পত্রিকায় এটি ছাপাতে দেয়ার সুযোগ পাননি। তাঁর পুরাতন কাগজপত্র ঘাটতে গিয়ে এটি পাওয়া যায়)

'ধর্ম কথাটা নিয়ে একদল চিন্তিত আর একদল ব্যস্ত। চিন্তিতের দল ধর্ম ভাবকে জিইয়ে রাখার জন্য ব্যাকুল আর ব্যস্তের দল ধর্ম নিয়ে হেসেই আকুল। ধর্মের নাম শুনে আমরা অনেকে আবার ভ্রুকুচকিয়ে নাক সিটকিয়ে সটান ভদ্রলোকের মত চলে যাই। ধর্ম ধ্বজাধারীরা (?) যে কি বলতে চায়, সেটা আমাদের বিবেকের বিচারে কতটুকু টিকে, তা চিন্তা না করেই কটাক্ষ করে রাস্তা দেখি। ধার্মিক স্বভাবের লোকের কথা শুনলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে লম্বা আধ-ময়লা আব্বা জোব্বা পরনে হাতে তছবিহ ওয়ালা চেহারা। আদিকালের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবন বলে ঠাট্টা করি। ধর্ম পুস্তকের নাম শুনলে তো আর রক্ষেই নেই, মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। মনে মনে বলি, শত বছরের পুরানো ঐ জীর্ণ পুঁথিগুলোকে (?) গাধার পিঠে উঠিয়ে গঙ্গার জলে বিসর্জন দেই। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সমাজের তথাকথিত প্রগতিশীলদের ধারণা এই। ভাববার বিষয়, এই বিকৃত ধারণা-বিদ্বেষের মূল কোথায়। এটা কি কোন আকস্মিক বাপার, না এর পেছনে কোন ইতিহাস আছে? এই দুটো প্রশ্নের উত্তর দিতেই চেষ্টা করবো এই ছোট্ট প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে।

মানব সৃষ্টি সম্পর্কে যত মতবাদ যত বিশ্বাসই থাক না কেন স্বয়ং ডারউইনও এটা অস্বীকার করতে পারেন না যে এই পৃথিবীতে সুষ্ঠু জীবন যাপনের জন্য কতকগুলো আইন-কানুন ও নিয়মনীতির অবশ্য প্রয়োজন। কেননা সৃষ্টির আর জিনিসের চেয়ে মানুষ অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। তাইতো সে সুষ্ঠু ও সুশৃংখল জীবন যাপন করতে চায়।

মানব সৃষ্টির পর অন্যান্য জীবের মত খোদা মানুষকেও ছেড়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তাহলে মানুষ সৃষ্টি পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যেত। তাই তিনি মানব সৃষ্টির পর এই পৃথিবীতে জীবন পথে চলার জন্য দিলেন কতগুলো আইন-কানুন। যাতে করে মানব সমাজ কল্যাণের পথে চলতে অকল্যাণের পথ থেকে ফিরে থাকতে পারে। যুগের পরিবর্তনের সাথে জীবনের জটিলতা বেড়ে গেলো, সমস্যার পর সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। খোদা তখন অনুগ্রহ করে পাঠালেন নবী ও অন্যান্য মহামানবদের, যারা মানুষের সকল জটিলতা ও সমস্যা চিন্তা করে আল্লাহর দেয়া ঐশী জ্ঞান ও আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের মধ্য দিয়ে পুর্ববর্তী বিধানগলোকে যুগোপযোগী করে তুললেন। এই বিধান ও আইন-কানুনের সমষ্টিই হলো ধর্ম। ধর্ম কোন গাঁজাখুরী ব্যাপার নয় বরং মানব সমস্যার সুপলিকল্পিত সমাধান।
মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান দিতে পারে ধর্ম। তবুও আমরা এটাকে সুনজরে দেখতে পারিনা? এরও একটা ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। যুগে যুগে মানুষ ধর্মের মূল সত্যকে বিকৃত করে নিজেদের মত ও পথকে আল্লাহর দেয়া বিধান বলে চালিয়েছে। ফলে মানুষের গড়া নিয়মনীতি মানুষের মঙ্গলের পরিবর্তে করেছে অমঙ্গল। দোষ হয়েছে ধর্মের। ফল হয়েছে এই যে, মানব সমাজের এক বিরাট অংশ ধর্মকে অস্বীকার করে গড়ে তুলেছে নিজেদের গড়া অসম্পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।

আধুনিক বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার সঙ্গে ধর্মের যে সংঘর্ষ তার মূল হচ্ছে মধ্যযুগের খ্রিষ্টীয় ইউরোপ। একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, খ্রিষ্ট ধর্ম তার আদি পবিত্র ও মৌলিকতা নিয়ে বিদ্যমান ছিল না। আল্লাহর দেওয়া বিধান ও হযরত ঈসা (আ)-এর বাণীর সাথে তদানীন্তন ধর্মযাজকদের স্বার্থ ভিত্তিক মতের সমন্বয়ে এক অদ্ভূত ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। বাইবেলের উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থা হযরত ঈসা (আ)-এর জীবন ব্যবস্থা নয় বরং তাতে হস্তক্ষেপের ও বিকৃত করণের সুস্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। বিকৃত খ্রিষ্ট ধর্মের অনেক মৌলিক বিশ্বাসই ছিল তদানীন্তন গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর মানুষের মনগড়া মতবাদ ও বিজ্ঞান চূড়ান্ত সত্য নয় বরং এগুলো মানুষের জ্ঞানের পরিধির তুলনায় পরিবর্তিত হচ্ছে যুগে যুগে। ফল হলো এই যে, গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান খ্রিষ্টধর্মের অনেক বিশ্বাসের মূলেই করলো আঘাত। ধর্মের উপরই আসলো অবিশ্বাস-সন্দেহ সংশয়।

মধ্যযুগে সমস্ত ইউরোপই শাসিত হতো রোম ও কনস্টান্টিনোপলের চার্চ দ্বারা। এই চার্চ শাসিত হতো গুটিকতক খ্রিষ্ট ধর্মযাজকদের দ্বারা। সমগ্র খ্রিষ্টান জগতে পোপ ছিলেন সর্বেসর্বা। আর নির্ধারিত আইন-কানুনের বিরুদ্ধে টু-শব্দটি করা কঠিন পাপ বলে গণ্য করা হতো। খ্রিষ্টধর্মের বিকৃত নীতি ও পোপের ক্ষমতা মিলে সমস্ত খৃষ্টজগতে আসলে ধর্মের নামে চলছিল ত্রাসের রাজত্ব। পোপ ছিলেন স্বর্গ মর্ত্যের একচ্ছত্র অধিপতি। কারো স্বর্গে যাওয়া না যাওয়া পোপের সার্টিফিকেটের উপর নির্ভর করতো বলে ধরা হতো।
পোপের নীতির সমালোচনাকে ইশ্বরের সমালোচনা মনে করা হতো এবং তার জন্য কঠিন দন্ডের ব্যবস্থা ছিল। বাইবেলের উপস্থাপিত বিকৃত আইন-কানুনের বিরুদ্ধে কেউ টু-শব্দ করলে তাকে নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পেষণ করা হতো। খ্রিষ্ট আদালতের এই আইনের নাম ছিলো ইসকুইজিশন। এটা প্রায় দু'শো বছর চলেছিল।

মানুষের চিন্তাধারা স্থবির নয়। ভাল হোক মন্দ হোক মানুষ সব সময়ই নতুন করে চিন্তা করতে চায়। চার্চ শাসিত ইউরোপে মানুষের চিন্তাধারা যখনই স্থবির হয়ে পড়েছিল তখনই কতকগুলো নতুনপ্রাণ নব্যপন্থীর আবির্ভাব হলো। তাঁরা মানুষকে নতুনভাবে চিন্তা করতে বললেন। এতে খ্রিষ্ট ইউরোপের ক্ষমতাসীন যাজক সম্প্রদায় প্রমাদ গুণলেন। চার্চের সকল প্রভাব ও ক্ষমতা ব্যবহার করে এই নব্যপন্থীদের হত্যা করা হলো। খ্রিষ্ট ধর্মের গোড়ায় গলদ থাকায় যুক্তি দিয়ে এ ধর্ম বিরোধী মনোভাবকে বাধা দেয়া গেলো না। উপরন্তু ক্ষমতা প্রয়োগ করার ফলে অবস্থা আরোও চরমের দিকে গেলো!

এদিকে খ্রিষ্ট ধর্মের অনেক সত্যই ভুল প্রমাণিত হতে লাগলো। কোপার্নিকাস যখন টলেমীর ভূকেন্দ্রিক মতবাদ (Geocentric Theory) ভুল প্রমাণ করলেন, তখন তো খ্রিষ্টধর্মের বিশ্বাসের মূলে আঘাত করলো। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কোপার্নিকাস তার এ মতবাদ প্রকাশ করতে পারেননি। যুবক বিজ্ঞানী ব্রুনোকে হত্যা করা হলো। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা গ্যালিলিওকেও চার্চের সামনে নতজানু হয়ে তাঁর প্রচারিত মতবাদ অস্বীকার করতে হলো। এই ছিল তখন খ্রিষ্ট ইউরোপের অবস্থা।

বেগবান নদীকে যদি বাধা দেয়া হয় তাহলে তা ফুলে ওঠে। তেমনি চার্চ তার সকল শক্তি দিয়েও এই নব জাগরণকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। প্রাচীন ও নব্যপন্থীদের এই আদর্শিক দ্বন্দ্ব থেকেই মূলতঃ ধর্মের প্রতি প্রগতিবাদীদের এ আক্রমনের উৎপত্তি।
খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতি আঘাত হেনেই প্রগতিবাদীরা শান্ত হলো না। তারা গোটা 'ধর্মটার' উপরই বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলো, সে খ্রিষ্টধর্মই হোক আর যে কোন ধর্মই হোক। রেনেসাঁ আন্দোলনের কর্ণধরগণ ভাবলেন, গোটা ধর্মই মানুষের অন্ধ ও অযৌক্তিক বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম যুক্তির আঘাত মোটেই সত্য করতে পারে না। কাজেই আল্লাহ, রসূল, পরকাল, ওহী প্রভৃতি সব কিছুকেই হাস্যকর বস্তুতে পরিণত করা হলো। এগুলোকে মানুষের যুগযুগের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের ফলমাত্র বলে ধরে নেয়া হলো। তাইতো আজ ধর্মকে সংশয়পূর্ণ মনে করা হয় আর বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের মতকে মনে করা হয় চূড়ান্ত সত্য-অন্ততঃ ধর্মনিবশ্বাসের মোকাবিলায়।

বিকৃত খ্রিষ্ট ধর্মের অত্যাচারে নব্যসমাজ হলো রুষ্ট। ফলে খ্রিষ্ট ধর্ম তো গুটিকতক লোকের আচারে পরিণত হলো। আর ইসসলাম ও অন্যান্য ধর্মও এই নব্যসমাজের শিকারে পরিণত হলো। প্রশ্ন উঠতে পারে, খ্রিষ্ট ধর্ম ও রেনেসাঁবাদীদের মধ্যে যখন এই আদর্শিক দ্বন্দ্ব হচিছল তখন ইসলাম কোথায় ছিল? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এই নব্যপন্থীরা ইসলাম সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারেন নি। কারণ গোটা ইউরোপের মধ্যে কেবলমাত্র স্পেনেই মুসলমানদের সভ্যতা সংস্কৃতির নিদর্শন ছিল। কিন্তু রেনেসাঁ আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি ইংল্যান্ড জার্মানী ফ্রান্সে তখনও ইসলামের আলো পৌঁছেনি। দ্বিতীয়ত, ধর্মের বিরুদ্ধে গোঁড়া মনোবৃত্তি থাকায় ইসলামও হয়ত তত আমল পায়নি।

ধীরে ধীরে জন্ম হোল হেগেল, স্পেন্সার, হিউম ও ডেকার্তের মত দার্শনিকের। কালাইল ও ভল্টেয়ারের মত লেখকের, মার্কস ও এঙ্গেলসের মত অর্থনীতিবিদের, ডারউইনের মত জীববিজ্ঞানী ও নিউটনের মত গণিত বিজ্ঞানীর। এই আলোকে যুগের (enlightenment) চিন্তাবিদগণ রচনা করলেন জড়বাদী দর্শন ও বিজ্ঞান। যদিও দার্শনিক-বিজ্ঞানীর ধারণাই অভ্রান্ত নয় এবং শত শত বার পরিবর্তিত হচ্ছে তবুও আমরা গোঁড়ামী করে তাই সত্য বলে মেনে নিচ্ছি আর আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের উৎস আল্লাহর দেয়া সত্যিকার জীবন ব্যবস্থাকে করছি অস্বীকার।

প্রত্যয়ের আলোকে আমাদের জীবন

'ইশ্বর যদি নাও থেকে থাকে তবে নিজের প্রয়োজনের খাতিরেই একজন ঈশ্বর তৈরি করে নাও'– কথাগুলো বলেছিলেন পাশ্চাত্যের এক আধা নাস্তিক দার্শনিক। আল্লাহকে আমরা অনেকেই স্বীকার করি কিন্তু নিরঙ্কুশ ব্যক্তি স্বাধীনতার বড়াই আমরা কেউই করতে পারি না– কোন না কোন সত্তার কাছে জ্ঞাতসারে হোক কিংবা অজ্ঞাতসারে হোক আমরা নিজেদের গর্বিত মাথাটা নত করে দিই-দিতে বাধ্য হই। সে সত্তা এ পৃথিবীতেও হতে পারে অথবা কোন অতি প্রাকৃতিক জগতেরও হতে পারে। তাই তো দেখি কট্টর কম্যুনিষ্ট নাস্তিকও তাদের সংগ্রামী দেবতা লেলিনের সমাধির সামনে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে। এমনিভাবে যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখব কেউ হয়ত ব্যক্তির পূঁজো করছে আবার কেওবা হয়ত সমষ্টির পূঁজো করছে, অর্থাৎ পূঁজো অর্চ্চনা, ইবাদত-বন্দেগী আমরা সবাই করছি, পার্থক্যটা হচ্ছে এই যে, আমি হয়ত আমার আপনার চাইতে অনেক বড় কোন মহাজাগতিক সত্তার আনুগত্য করছি, আর আপনি আপনারই মত কোন মানুষের অথবা তারে চাইতে নিকৃষ্ট কোন সত্তার দাসত্ব করছেন। তাহলে একটি সত্যই আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, সৃষ্টিপ্রকৃতির দিক দিয়ে মানুষ নিরঙ্কুশভাবে স্বাধীন নয়– কোন না কোন সত্তার আনুগত্য করা তার জন্মগত বৈশিষ্ট্য। মনীষীরাও এ সত্যকে অস্বীকার করেন না। নিউটন ও আইনস্টাইন বিস্ময়কর সুশৃংখল সৃষ্টির পশ্চাতে সক্রিয় এক ঐশী সত্তার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। ভলটেয়ারের মত মুক্ত বুদ্ধি ও মানব প্রগতির অন্যতম প্রবক্তাও খোদার অকিস্তত্বকে অস্বীকার করতে পারেনি। অবশ্য ভলটেয়ারের খোদা বাইবেল বা কুরআনের খোদা নয়। নীটশের মত গোড়া নাস্তিক সরাসরি খোদার অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও অতি মানবের (Superman) অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং তারই হাতে বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ ভার তুলে দিয়েছেন। অর্থাৎ কম বেশি সবাই খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু সমস্যাটা হলো সেই খোদা আমাদের কোন খোঁজ-খবর রাখেন কিনা আমরা কি তাঁর আইন ও ক্ষমতার আওতায় না একবারেই স্বাধীন আমরা কি তাঁরই আইন মেনে চলবো না নিজেরাই নিজেদের পরিকল্পনা ভার গ্রহণ করবো এমন কতিপয় প্রশ্ন নিয়ে। যদি বলা হয় আল্লাহ তো আমাদের স্রষ্টা, আইন-কানুন কেবল তাঁরই মেনে চলা দরকার, তখন বলা হবে, এটাতো একটা Abstract Idea আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আমরা তো কেবল তাই বিশ্বাস করি, যা আমরা চোখে দেখি, কানে শুনি, হাত দিয়ে স্পর্শ করি অর্থাৎ সোজা কথায় ইন্দ্রিয়াতীত কোন সত্তার আনুগত্য আমরা মেনে নিতে প্রস্তুত নই। বস্তুত আধুনিক জীবন দর্শনই হচ্ছে আমরা যা কিছু ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করি তা-ই সত্য এবং তারই মূল্যমান আছে।

বস্তুবাদী জীন দর্শনে Truth এবং Reality কেও আমরা বস্তুর সীমিত পরিসরের বাইরে যেতে দিই না। আমাদের সকল লক্ষ্য ও সাধনা কেবল মাত্র বস্তু ও বস্তু জগতের উন্নতিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। দৈহিক সুখ ও দুঃখকেই আমরা জীবনের সফলতা ও বিফলতার একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে ধরে নিতে বাধ্য হয়েছি। মানুষের উন্নত মুল্যবান অস্বীকার করে গোটা মানব সত্ত্বাকে আর দু'দশটি বস্তুর ন্যায় কতকগুলো অজৈব পদার্থের সমন্বয় হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদ মানব প্রকৃতির উত্তম দিকগুলোর স্থান দখল করেছে। বক্তি ও সমাজের সম্পর্কে ধরেছে ফাটল। বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা ধারার আবার সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্নতা, আর এ তেকেই আস্তে আস্তে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে ভোগবাদ, উপযোগবাদ, সংশয়বাদ, পুঁজিবাদ, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ইত্যাদির এবং এভাবেই সমাজ সভ্যতা তথা গোটা মানবজীবন প্রহসন মাত্রে পরিণত হয়েছে। প্রবন্ধের এই অংশে আমরা পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে বিচার করে দেখব জীবনে আমরা পেয়েছি কি? হারিয়েছি কতটুকুইবা? প্রকৃতি বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ মানুষের জীবনকে করেছে সম্পদশালী, স্থান-কাল পাত্রের ব্যবধান করেছে দূরীভূত। প্রকৃতির কোণায় কোণায় মানুষ বিজয়ীর বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে উৎপাদন বেড়েছে অনেক, আর মানুষের

ভোগের সামগ্রীও হয়েছে প্রচুর। মানুষের সষ্টিধর্মী প্রতিভার হয়েছে চরম বিকাশ, সমাজ ও সভ্যতার পরিসরও গেছে তাই বেড়ে। আমরা তাই হতবাক হয়ে যাই আমাদের সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে।

এতো গেল জীবনের একদিক– উজ্জ্বল দিক, অন্যদিকে বস্তুতান্ত্রিক এই সভ্যতার উৎকর্ষের ফলে আমাদের জীবনের চরম অধঃপতন সুচিত হয়েছে। পশ্চিমের এই সভ্যতায় আমরা পেয়েছি অনেক কিন্তু হারিয়েছি তারও বেশি। মানব জীবনের গোটা কাঠামোকে ধ্বংস করেই এই সভ্যতা গড়ে তুলেছে এর সৌধ। বস্তুর উন্নতি জীবনের স্বায়িত্ব শান্তি ও নিরাপত্তা আনতে পারেনি। প্রকৃতি জয়ের সংকল্প নিয়ে যান্ত্রিক সভ্যতার সৃষ্টি করেছিলাম তা এখন আমাদেরই জীবনকে সংশয়ের আবর্তে নিক্ষেপ করেছে, বিঘ্নিত করেছে আমাদের গোটা অস্তিত্বকে, আমরা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। আমাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আমাদের জন্যই ধ্বংসযজ্ঞের আয়োজন করেছে। প্রকৃতি বিজ্ঞান মানুষের জ্ঞানের সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে সত্য কিন্তু তার বিবেকে জাগিয়ে তুলতে পারেনি। আর এজন্যই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি আমাদের ধ্বংস কাজে ব্যাপৃত। Russel তাইতো **বলেছেন** Knowledge is power but it is power for evil just as much as for good. If follows that unless man increases in wisdom as much as in knowledge will be increase of sorrow.

বস্তুতান্ত্রিক দর্শন জীবনের ভিত্তি মূলে আঘাত করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং মানবসত্তার অনন্য বৈশিষ্ট্য মানুষকে জড় বস্তুর একটি রূপান্তর ছাড়া অধিক কিছু কল্পনা করতে পারেনি। মহাকাশের অসীম বুকে ভাসমান একটি গ্রহের বুকে নৃত্যশীল ক্রীড়নক সত্তার অধিক দাম দেয়নি। জড় বিজ্ঞান তাই মানুষকে বলেছেন–

The level of a mere reflex mechanism a mere organ motivated by sex, a mere semi mechanical semi psychological organism devoid of any divine spark of any absolute value of anything noble and sacred আর **তাই বোধ হয়** Alixis crrel **দুঃখ করে বলেছিলেন,** Today the most neglected of study is poor man.

আধুনিক জীবন দর্শনে চূড়ান্ত সত্য (Absolute truth) বলতে কিছু নেই। পুরাতন সত্যের সাথে নবাগত সত্যের সংঘর্ষের ফলে দু'টোই বিলুপ্ত হচ্ছে আর সেখানে synthesis হচ্ছে নতুন আর একটি সত্যের। তাও আবার আপেক্ষিক– ক্ষণকাল পরেই মিলিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক যুগ সভ্যতা জীবনের নৈতিক ও আর্থিক দিক অস্বীকার করে কেবল দৈহিক সত্তারই পুষ্টি সাধন করে যাচ্ছে। অষন্ড জীবনকে খন্ড খন্ড ভাগে ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন Water tight compartment গড়ে তুলেছে। দেহ ও আত্মার মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছে এক কঠিন দ্বন্দ্ব। বস্তুবাদী দর্শনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে আত্মা হয়েছ একটি মৃতদেহ।

আধুনিক যুগ সভ্যতায় প্রবণতা হচ্ছে জীবনকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের (dialelical materialism) দ্বারা ব্যাখ্যা করা। ফলে অতীতের সকল সত্যই আজ সন্দেহের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতকে অস্বীকার করে বর্তমান সর্বস্ব হওয়ার এক উৎকট মানসিকতা, আধুনিক মানুষের মজ্জাগত ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।

জীবনের পরম সত্যগুরোর ক্ষেত্রেও আপেক্ষকিতাবাদের প্রয়োগের ফলে সৃজনশীল মানুষের কর্মপ্রেরণা অনকেখানি কমে এসেছে। কারণ আমি আজ সে সত্যের সৃষ্টি করব তা আগামী প্রভাতের সূর্যোদয়ের আগেই বিলীন হয়ে যাবে– ক্ষণিকের স্থায়িত্বের জন্য নিশ্চয়ই আমার মনে কোন বৃহৎ সৃষ্টির প্রেরণা জাগতে পারে না। সরোকীন আধুনিক সভ্যতার এ বীভৎস চিত্রই অংকন করেছেন–

Yesterday's values are absolute tomorrow, and who can create anything perennial in this inconstant Niagara of change. By because of this feverish chang, our culture devours its own creations, as soon as they emerge, today it builds enormous buildings from steel and concrete, tomorrow it tears them down. Today it erects to

aim new fangled god in science and philosophy, in religion and fine arts, and in any of its compartments tomorrow it will demolish it into smoke. In this sense our culture is new cronous incessantly devowing his own children. Hardly anything perennial can be created, and nothing can survive this perennial destruction.

বস্তুর মুল্যমান এখানে কখনও তার অন্তর্নিহিত গুণাবলির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় না– নির্ধারিত হয় তার পরিব্যাপিতে। আমাদের দৃষ্টিতে তাই যা কিছু বৃহৎ, তাই মহৎ।

অন্যদিকে আণবিক শক্তির অপব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই আমাদের জীবনকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে– সংশয়ের অন্যদিকে আণবিক শক্তির অপব্যবহার স্বভাবিকভাবেই আমাদের জীবনকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে– সংশয়ের আবর্তে আমরা প্রতিনিয়তই ঘুরপাক খাচ্ছি। জড়বাদী দর্শন শিখিয়েছে– জেকার যার মল্লুক তার, বেঁচে থাকার অধিকার তারই আছে, যে জকড়জগতের নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে বিজয়ী হতে পারে। দুর্বলকে গ্রাস করা সবল তার নিজস্ব অধিকার বলে মনে করে। পাশ্চাত্যের বৃহৎ শক্তিগুলোপ তাইতো প্রাচ্যদেশীয় ক্ষুদ্র শক্তিগুলোকে শোষণ করা কোন নৈতিক অন্যায় বলে মনে করে না। কারণ নিরন্তর সংগ্রামমুখর এই পৃথিবীতে দুর্বলের বাঁচারই কোন অধিকার নেই।

বিজ্ঞানের জয়াযাত্রা তাই সামগ্রকভাবে মানুষের জীবনের কোন সমৃদ্ধি আনতে পারেনি। সঘাতের মুখে পড়ে পড়ে কেবল মানুষ মার খাচ্ছে জীবনে সৃষ্টি হয়েছে এক গভীর শূণ্যতা। আধুনিক শিল্পসভ্যতা ও বিশৃংখল জীবন দর্শনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তাই এক মনীষী বলেছিলেন–

People are fleeing from ghosts pursuing them fleeing from their inner natures the material prosperity, sensual enjoyment and sexual satiation lead to a sinking into the morass of nervous & psychological disease, sexual perversion, constant anxiety, illness and misery, frequent crime and lack of human dignity in life.

সংশয়ের আবর্তে আমাদের জীবন। আর সংশয়ের আবর্তে নিমজ্জিত হওয়ার প্রধান কারণই হলো আমরা বস্তুর দাসত্ব করছি– নিজেদের মাথাকে বস্তু দেবতার সামনে নত করে দিয়েছি। বস্তু বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশে আত্মহতারা হয়ে গিয়ে আমরা নিজেরাই মানব জাতিকে পরিচালনার জন্য আইন প্রনয়ন করছি, বিধান দিচ্ছি। এভাবে এক গোষ্ঠী সেজেচ বসেছে বিধানদাতহা প্রভু আর অবশিষ্ট্রমানুষ তাদেরই দাসত্ব করছে। অথচ মানব জাতির জন্য সুষ্ঠ বিধান দিতে হরে চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে সেই বিধানদাতা সত্তার।

প্রথমত, তাকে হতে হবে গোটা মানব জাতির ওপর ন্যায় পরায়ণ, যাতে করে কোন মানুষ বা মানুব সমষ্টির উপর পক্ষপাতিত্ব না হয়।

দ্বিতীয়ত, তাকে মানুষের দৃশ্য-অদৃশ্য, অনুভূত-অননুভূত সকল প্রকৃতির সাথেই হতে হবে পরিচিত।

তৃতীয়ত, তাকে একই সাথে সকল মানুষ্যের জন্যই হতে হবে কল্যাণকামী ও মঙ্গলময়।

চতুর্থত, মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের দ্রষ্টা হতে হবে।

উল্লিখিত চারটি মৌলিক প্রয়োজনীয় গুণ মানুষের মধ্যে বতৃমান নেই। আর নেই বলেই মানুষের দেয়া আইন কানুন সমাজের সঠিক কল্যাণ সাধন করতে পারেনি। একটি সমস্যার সমাধান দিতে যেয়ে হাজারো সমস্যার সৃষ্টি

করেছে। মোট কথা হাতুড়ে ডাক্তারের কাছে রোগীর যেমন কোন নিরাপত্তা নেই তেমনি মানুষের মনগড়া আইন ও বিধানের কাছেও সমাজ ও জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই।

উপরোক্ত চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা করলে সার্বভৌমত্ব ও আইন প্রনয়ণের ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহরই হাতে অর্পণ করতে হয়। কারণ তিনি গোটা মানব জাতির জন্যই নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচারক। তিনিই কেবলমাত্র মানুষের দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রকৃতি নির্ণয়ের জ্ঞান রাখেন এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সম্যক দ্রষ্টাও তিনিই। তাই সত্যিকার জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র কেবলমাত্র তাঁরই সার্বভৌমত্ব ও বিধান মেনে নিয়েই গড়ে উঠতে পারে। সংশয়ের আবর্তে নিক্ষিপ্ত জীবন এভাবেই পেতে পারে মুক্তির সন্ধান। আর তাইতো কুরআন বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছে– 'আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কোরো নেই। আর অস্বীকার করেছে তাদেরকে, যারা আল্লাহর দেয়া বিধানের পরিবর্তে মেনে নিয়েছ আর কোন বিধানকে কুরআন বলে : তারা কি আল্লাহর মনোনিত পথ চাড়া অন্য কোন পথের সন্ধান করে? অথচ আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কেবল তাঁরই আনুগত্য করছে। আর তারাও তো অবশেষে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।'

আল্লাহর মনোনীত এই পথই হচ্ছে 'ইসলাম' অনেকে ইসলাম বলতে বুঝেন মানুষের বাস্ব জীবনের সাথে সম্পর্কহীন ব্যক্তি বিশেষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সাধনার ব্যাপার। তাদের মতে ইসলাম একটা আধ্যাত্মবাদ বা পরলোকতত্ত্ব, কিন্তু একথা আদৌ সত্য নয়। কুরআনের অধিকাংশ অধ্যায়ই মানুষের অর্থনীত, রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক ও সমস্যা নিয়েই আলোচনা করছে এবং এই পৃথিবীর জীবন একটা সুষ্ঠু ইঙ্গিত দিয়েছে, অতএব ইসলাম একটি ধর্মমাত্র নয়, নিঃসন্দেহে একটি পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা।

ইসলাম কখনই মানুষের প্রকৃতি ও তার বস্তু সত্তাকে অস্বীকার করেনি। বস্তুসত্তার বিকাশের ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে, তবে মানুষকে বস্তুর দাস করে তুলতে চায়নি কখনও। আর সেই জন্যই ভারসাম্যপূর্ণ একটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এর দ্বারা সম্ভব হয়েছে। ইসলাম মানুষকে সত্যিকার মানবিক মর্যাদা দিয়েছে– তাকে সকল সষ্টির ওপরে প্রতিপত্তিশীল এক সৃষ্টিরূপে ঘোষণা করে। ইসলামই মানুষকে সত্যিকার স্বাধীনতা দিয়েছে– মানবতার সীমার মধ্যে তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সুযোগ দিয়েছে। আল্লাহর দেয়া এ জীবন ব্যবস্থাই মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে, মানুষের দেওয়া ভ্রান্ত আইন ও বিধানের মুলোৎপাটন করে মানুষের প্রভূত্ব ও সার্বভৌমত্বকে খতম করেছে। এভাবে মানব মন ও মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক বাস্ব জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করেছে।

কারো কারো ধারণা ইসলাম তো একটা খোদায়ী বিধান, কাজেই কোন অতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রত্যক্ষ হস্ক্ষেপ ছাড়া এর প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কিন্তু এ ধারণা সত্য নয়। অতীতে আমরা দেখেছি একদল মানুষের চেষ্টা সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফলেই এই জীবন বিধান দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজো যদি সেই প্রচেষ্টা ও সাধনার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহলে ইতিহাস আর একবার তার অধ্যায় পরিবর্তন করতে বাধ্য।

অনেকে বলে থাকেন– ইসলামী জীবন ব্যবসথা মেনে নিলে জীবন নিরস শুষ্ক হয়ে যায়। বিধি নিষেধের শৃংখলে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, ভোগের সকল স্বাধীনতা থেকেই বঞ্চিত হতে হয়। কিন্তু আসলে এগুরো মোটেও ঠিক নয়। এই বিভ্রান্ত চিন্তাধারা কতটা উদ্দেশ্যপ্রসূত এবং অনেকটা অজুহাতবশতঃ। পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই ইসলামকে কেবলমাত্র একটি আদর্শবাদ হিসেবে দেখতে প্রয়াস পান। তাদের লেখনিতে প্রায়ই ইসলামরে অবাস্ব ও অনুপযোগী কাল্পনিক রূপ ফুটে উঠে। উদ্দেশ্যটা হলো, ইসলাম সম্পর্কে মানুষের চিন্তাধারায় একটা হতাশার সৃষ্টি করা। আসলে সত্য ব্যাপারটা হলো এই যে, ইসলাম যেহেতু মানুষের জন্যই একটি জীবন ব্যবস্থা এবং মানব

প্রকৃতির সাথে পুরো সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব এটি কোন মতেই মানুষের ওপর তার প্রকৃতি বিরোধী কোন কিছুই চাপিয়ে দিতে পারে না। ইসলাম তো কেবল মানুষের অভ্যন্রীণ প্রচ্ছন্ন শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে তাকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির উচ্চতম শিখরে নিয়ে যেতে চায় ইসলামের নৈতিকতা কেবলমাত্র কতকগুলো বিধিনিষেধের সমষ্টি নয় বরং এ হচ্ছে এক গঠনমূলক শক্তি যা গোটা জীবনকে ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের দিকে এগিয়ে নিযে যায় এক সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও পবিত্র পরিবেশের মধ্য দিয়ে। ইসলামের নৈতিক বিধান অন্যায়ের প্রতিরোধ করে এবং ন্যায়ের বিকাশ ঘটায় এব এভাবেই ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধন করে। ভোগের বিরোধিতা ইসলাম কোনদিন করেনি তবে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে বহুবার। কারণ ভোগের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা গোটা সমাজ জীবনকে বিষাক্ত করে তোলে, সামাজিক কাঠামোকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। তাই সত্যিকার সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। সকল প্রকার অন্যায় ও অসত্য মানুষের আত্মাকে শৃংখলিত করে এবং মানব মনকে করে দেয় বিকারগ্রস্ত। এজন্য ইসলাম প্রথমেই অন্যায় ও অসত্যের মূলোৎপাঠন চায়। অবশ্য একথা সত্য যে, অনৈসলামী পরিবেশে একজন মুসলমানের জীবন যাপন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং দূরূহ ব্যাপার। আর সে জন্যই বর্তমান মুসলিম জীবন ধারার দিকে তাকিয়ে ইসলামকে শুষ্ক ও নিরস এক জীবন ব্যবস্থা বলে মনে হয়। ইসলামের সামাজিক পরিবেশে একজন মুসলমানের জীবন অত্যন্ত সরস ও জীবন্ত।

অনেক বিজ্ঞ ব্যক্ত আবার বলে থাকেন, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তো আলী (রা)-এর শাহাদাতের সাথে সাথেই শেষ। প্রতিকল পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকার ক্ষমতা ইসলামি জীবন ব্যবস্থার নেই। কাজেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে তারা একটা Utopia বলে মনে করেন। আসলে তাদের এ ধারণাটাও ভুল এবং ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা মাত্র অর্ধ শতাব্দীর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে একক আধ্যাত্মিক, নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর প্রতিষ্ঠা করেছিল তা বিগত হাজার বছরেরও অধিক কাল দুনিয়ার সকল অজ্ঞতা, মূর্খতার সম্মিলিত বাধার সামনে নির্বিকার শাশ্বতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্য বিশ্বব্যাপী মূর্খতার সম্মিলিত আক্রমণে প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থা ক্ষয়িত হয়েছে এবং মূল গতিপথ থেকে বিচ্যুতও হয়েছে। কিন্তু এর আদর্শিক ভিত্তিমূলে বিন্দুমাত্র ক্ষতি হতে পারেনি।

একথা সত্য যে পূর্ণরূপে বিকশিত প্রতিপত্তিশীল একটি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ছিল স্বল্পকালের জন্য। ইতিহাসের চরম উৎকর্ষের যুগটি আমাদের জন্য একটা ইঙ্গিতমাত্র ছিল। অল্প সংখ্যক লোকের প্রচেষ্টা ও সাধনায় যে সত্যের প্রকাশ হয়েছিল, দুনিয়ার মানুষকে সভ্যতার আলো দান করেছিল– তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা কেবল কল্পনা বিলাস নয়, আগামীকালের সূর্যোদয়ের মতই সত্য।

(শহীদ আবদুল মালেক ইসলামের পক্ষ সমর্থনের অপরাধে ১২ আগস্ট ইসলাম বিরোধী একদল ছাত্রের প্রহারে গুরুতর আহত হয়ে গত ১৫ই আগস্ট বাদ মাগরিব ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতারে শাহাদাতপ্রাপ্ত হন। তার স্মৃতিস্বরূপ তাঁর স্বরচিত এই প্রবন্ধটি ২২শে আগস্ট দৈনিক আজাদে প্রকাশিত হয়েছিল।)

পত্রাবলি

(বগুড়া জেলাস্কুলে নবম শ্রেনীতে অধ্যয়নকালীন তার পিতার নিকট লেখা পত্রের অংশ বিশেষ)

এক.

Bogra
২০.১২.৬১

পাক জনাবেষু,
বাড়ির কথা ভাবিনা, আমার শুধু এক উদ্দেশ্য, খোদা যেন আমার উদ্দেশ্য সফল করেন। কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছি এবং কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ন, দোয়া করবেন খোদা যেন সহায় হন। আমি ধন-সম্পদ কিছুই চাইনা, শুধুমাত্র যেন প্রকৃত মানুষরূপে জগতের বুকে বেঁচে থাকতে পারি।
ইতি
এ মালেক
Class-IX B
(মালেক ভাইয়ের ডায়েরী থেকে সংগৃহীত)

শহীদ মারেফ স্কুল জীবনে নজিং থাকতেন বগুড়ার জোরখালী গ্রামের জনাব মহিউদ্দীনের বাড়িতে। পরবর্তীকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসে তিনি মাঝে মাঝে জনাব মহিউদ্দীন ও তাঁর ছেলে বন্ধু-প্রতিম বেলালকে নানাভাবে উৎসাহব্যঞ্জক চিঠিপত্র লিখতেন। এসব পত্রে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছাড়াও ইসলামের জন্যে তাঁর জিহাদী উদ্দীপনা ও খোদার পথে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে তার কয়েকটি পত্র থেকে কিছু কিছু অংশ প্রকাশ করা হলো।

দুই

ঢাকা

১২. ০৩.৬৫

কোন এক প্রবাতেকর শিশিরের মধ্য দিয়ে 'আমি শিশুর' যাত্রা শুরু হয়েছে, কে জানে কখন এ যাত্রা শেষ হবে।

এ. মালেক

তিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৪ শে ফেব্রুয়ারি, ৬৬

পাক জনাবেষু,

আসসালামু আলাইকুম। প্রায় মাস দুয়েক হলো আপনার সাথে কোন যোগাযোগ নেই আমার। আপনাদের বাড়ি দু'বার গিয়েছিলাম। তখন আপনি বাইরে ছিলেন। একটি ছোট্ট চিঠিও দিয়ে এসেছিলাম, কিন্তু অনেক আশা করেও তার কোন জবাব পাইনি। জানি না গোটা পৃথিবীটাই কি আমার বিরুদ্ধে! সব দিকই যেন নীরব হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

আসল কথা কি জানেন; বাইরের পৃথিবীতে যেমন দ্বন্দ্ব চলছে, তেমনি আমার মনের মধ্যে চলতে নিরন্তর সংঘাত। কি করলে আমার মঙ্গল, কোনটায় আমার অমঙ্গল, কিছুই আমি স্থির করতে পারছি না। জীবনের বিপদ-মঙ্গল মহাসমুদ্রে আমি হাবুডুবু খাচ্ছি। কূলহীন নিয়ত বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ রাশিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। পাবো কি কোন ঠিকানা? এই মহা জিজ্ঞাসা আমায় ব্যাকুল করে তুলেছে। যে দিক তাকাই দেখতে পাই, সবাই ছেড়ে চলছে আমায়। আমার জগতে— আমার জীবনে তাই আমি খুঁজে নিতে চাই এক কঠিন পথ, জীবন মরনের পথ।

মায়ের বন্ধন ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। বৃহত্তর কল্যানের পথে সে বন্ধনকে ছিঁড়তে হবে। কঠিন শপথ নিয়ে আমার পথে আমি চলতে চাই। আশীর্বাদ করবেন, সত্য প্রতিষ্ঠার এ সংগ্রামে যেন আমার জীবনকে আমি শহীদ করে দিতে পারি।

আমার মা এবং ভাইরা আশা করে আছেন, আমি একটা বড় কিছু হতে যাচ্ছি। কিন্তু মিথ্যা সে সব আশা। আমি চাইনে বড় হতে, আমি ছোট থেকেই সার্থকতা পেতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র হয়ে বিলেত থেকে ফিরে যদি বাতিলপন্থীদের পিছনে ছুটতে হয়,. তবে তাতে কি লাভ?

আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসগুলোর চেয়ে ইসলামী ছাত্রসংঘের অফিস আমার জীবনে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জানি, আমার কোন দুঃসংবাদ শুনলে মা কাঁদবেন, কিন্তু উপায় কি বলুন? বিশ্বের সমস্ত শক্তি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। আমরা মুসলমান যুবকরা বেঁচে থাকতে তা হতে পারে না। হয় বাতিলের উৎখাত করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করবো, নচেৎ সে চেষ্টায় আমাদের জীবন শেষ হয়ে যাবে। আপনারা আমায় প্রান ভরে আশর্বাদ করুন; জীবনের শেস রক্তবিন্দ দিয়েও যেন বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারি। কারাগারের নিরন্ধ্র অন্ধকার, সরকারী যাঁতাকলের নিষ্পেষণ আর ফাঁসির মঞ্চও যেন আমায় ভরকে দিতে না পারে।

মিসরের কুচক্রী নাসের আবার সেখানকার একমাত্র ইসলামী প্রতিষ্ঠান 'ইখওয়ান' কে ধ্বংস করার কাজে উঠেপড়ে লেগেছে এবং তার কর্মীদের ফাঁসি দেয়ার ষড়যন্ত্র করছে। এই অত্যাচারী জালেমদের উৎকাত করতে হবে। আমাদের সামনে হাসান হোসাইনের রক্ত— আমাদের চোখে শহীদ হাসানুল বান্নার সংগ্রামী জীবন ভাসছে। বলুন, এত অত্যাচার সহ্য করেও কি চুপচাপ বসে থাকতে হবে?

সেদিন মাওলানা মওদূদীকে সম্বর্ধনা জানাতে এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম। এক স্বর্গীয় মহাপুরুষের দর্শন লাভ ঘটল। বিস্ময়ে সেদিন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। এক নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করবার শপথ সেদিন থেকে নিয়েছি। এই লেখাপড়াটা আমার কাছে যেন জ্বর– ছেড়ে গেলেই বাঁচি। যা হোক আপনি আমার শ্রদ্ধেয় আপনজন। মনের কথা আপনার কাছেই খুলে বলার চেষ্টা করি। এসব কথা যেন আর কেউই না জানে। আমার পরিবার–পরিজনরা এর একটি কথা ঘূনাক্ষরেও যেন জানতে না পারে। সব শেষে আপনাদের দোয়া কামনা করি। আপনাদের সবার প্রতি আমার সালাম ও শুভেচ্ছা। আপনার পত্রের আশায় বসে রইলাম।

খোদা হাফেজ

এম. এ. মালেক

চার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০ই আগস্ট, '৬৯

পাক জনাবেষু,
সালাম নেবেন। বহুদিন পর আপনার কাছে চিঠি লিখছি।
আমার পরীক্ষা সামনে, সেপ্টেম্বরে। পড়াশুনা করছি কিছু কিছু। শরীরটা বেশি ভাল যাচ্ছে না। মনটা আরো বেশি খারাপ। পাকিস্তান এক সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে। ইসলাম ও ইসলামবিরোধী শক্তির মধ্যে চূড়ান্ত এক সংঘর্ষের প্রচুর সম্ভাবনা লক্ষ্য করছি। জানি না কি হবে।
খোদা হাফেজ। দোয়া করবেন।
আপনাদের স্নেহের
ম. আ. মালেক
(আবদুল মালেক শাহাদাতের মাত্র দু'দিন পূর্বে জনাব মহিউদ্দীনকে এ পত্রটি লেখেন। এটাই তাঁর শেষ চিঠি)

পাঁচ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২১শে সেপ্টেম্বর '৬৬

প্রিয় বেলাল,

মুসলমানের জিন্দেগী খুবই কঠিন। 'জাহানে নও' হয়ত পড়ে থাকবে। গত ২৯শে আগস্ট মিসরে যারা ইসলামী আন্দোলন করতেন, সেই 'ইখওয়ানুল মুসলিমুনের' তিনজন নেতাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ সাইয়েদ কুতুব। ১৯৫৪ সালেও এ দলের ছয়জন নেতাকে ফাঁসি দেয়া হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন মিসরের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি ড. আব্দুল কাদের আওদা। এ সময় সাইয়েদ কুতুবের দশ বছরের কারাদণ্ড হয়। ইসলামী আন্দোলনে মিসরের মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। এবার জয়নাব গাজ্জালী নাম্নী এক মহিলাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। সাইয়েদ কুতুবের বোন হামিদা কুতুবকে দেয়া হয়েছে দশ বছরের কারাদণ্ড। বেলাল, চিন্তা করতে পার কি এদের কথা? এদের জীবন শহীদের-মুজাহিদের জীবন। মৃত্যুও শহীদের মৃত্যু। এদের অপরাধ ছিল এই যে, এরা মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসেরের অনৈসলামী কাজের সমালোচনা করেছিলেন। আমাদেরকেও ওদের মত হতে হবে। রসূলের পথ এই শাহাদাতেরই পথ। তোমরা তাই জেগে ওঠ। তৈরি হও সেই চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য। এই শপথ নাও—

'আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর জমীনে গালেব করার জন্য আমরা দরকার হলে নিজেদের জান-মাল কুরবানী করতেও কুণ্ঠিত হবো না।'

বেলাল, তোমরা ছোট এখনও কিছুই জাননা। আমরা অনেকটা বুঝতে পারি। তাই আমাদের বুকটা ব্যথায় টনটন করে ওঠে। আমার বুকের ব্যথাটা যদি তোমাদেরকে জানাতে পারতাম। ভাই, জিন্দেগীর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা।

তোমাদের
মালেক ভাই

ছয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৩ই মার্চ '৬৭

প্রিয় বেলাল,

শুভেচ্ছা নিও। আশা করি, ভাল আছ। তোমার দু' দুটো চিঠি পেয়েছিলাম অনেক দিন আগে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার উত্তর দিতে পারিনি। শরীর ও মন কোনটাই বাল যাচ্ছে না ক'দিন থেকে। অনেক চিন্তা-ভাবনা মাথার ভেতর জট পাকিয়ে আছে। কখনও কখনও মনে হয়, কি করবো লেখাপড়া করে? আবার অনাগত ববিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বইটা টেনে নেই। জানি এক অনন্ত কালের বুকে আমার জৈবিক সত্ত্বা বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু তাকে তো অস্বীকার করা যায় না। আমরা এক সুনির্দিষ্ট পত ধরে চলেছি— তোমার মত তরুনরা হবে সে পথের যাত্রী। আমরা হবো তার অগ্রপথিক। আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা, তুমিও হবে সেই তরুন মুজাহিদ দলেরই একজন সাথী। হেরার গুহা থেকে যে জ্যোতি বিচ্ছুরিত, তাই হবে তোমার পথে দিশা। খুন রাঙা তলোয়ার হবে তোমার সম্বল।

তোমাদের কথা সব সময়ই মনে পড়ে; কিন্তু সময় করে উঠতে পারি না।

সংঘের বার্ষিক সম্মেলনে এলে বুঝতে পারতে পাকিস্তানের তরুন মুজাহিদরা কিভাবে এগিয়ে চলেছে এক সোনালী উষার পানে। আট শ'রও বেশী ছাত্রের এ সম্মেলন অনেকেরই মনেই কঠিন দাগ কেটেছে। মুজাহিদদের দৃপ্ত কণ্ঠের ধ্বনি সেদিন ঢাকার আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছিল। অত্যাচারী অনৈসলামী শক্তির বুক সেদিন কেঁপে উঠেছিল। তুমি আসবে বলে ক'দিন সকাল বিকাল অনেক কাজের মাঝেও স্টেশনে খোঁজ নিয়েছিলাম। যাকগে সে সব। এখন কেমন কাজ করছো জানার জন্য মনটা বড় ব্যাকুল। কারন কচি-প্রান তরুনদের তাজা খুন জাহান্নামের আগুনে পুড়ুক, ভাবতেও যেন কেমন লাগে। ভালভাবে কাজ কর! বইগুলো পড়ার ব্যবস্থা করো।

তোমাদের সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা।

ইতি
তোমাদের
মালেক ভাই

সাত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৩ই এপ্রিল, '৬৭

প্রিয় বেলাল,

সালাম ও শুভেচ্ছা নিও। বসন্তের এক সোনাঝরা সকালে অনেক, অনেক দূরের একটি কামরার পশ্চিমের জানালা দিয়ে তোমাদের স্মরণ করছি। আমার স্মরণ পথের দিগন্ত রেখায় মুজাহিদ বেশে তোমাদের দেখতে পাচ্ছি। সে কাফেলা গিরি-দরি-বন ভেদ করে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে খাইবারের প্রান্ত থেকে চট্টলার সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত।

তোমার চিঠি পেয়েছি। আগাগোড়া বার কয়েক পড়লাম। পড়ে অনেক কিছু বুঝলাম। পরের চিঠিতে আরো একটু খুলে লিখো। সৃষ্টির আদি থেকে একটি শাশ্বত নিয়মের মত এ সত্য চলে এসেছে যে, যে মহাপুরুষই সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজের মন-প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছেন, নির্মম সমাজ সেই মহাপুরুষকেই কঠিন ও নির্দয়ভাবে আঘাতের পর আঘাত হেনেছে। বিদ্রূপ, গঞ্জনা, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার এই ইতিহাস নতুন কিছু নয়। আরবের বালুকণা ও প্রস্তর কাদের তাজা খুনে রঞ্জিত হয়েছিল? ওমর, ওসমান, আলী আর হাসান-হোসাইনের জীবননাশের জন্য দায়ী কারা? ওমর ইবনে আবদুল আজিজ, মুহাম্মদ ইবনে কাসিম, কোতায়বা কাদের ষড়যন্ত্রে নিহত হয়েছিলেন? ইসলামের ইতিহাস পড়ে দেখ, রক্তের লাল স্রোত শুধু কারবালায়ই শেষ হয়ে যায়নি, আজও পৃথিবীর বুকে সমস্ত কারবালার সৃষ্টি হচ্ছে। আজও মুসলমান ফাঁসির মঞ্চে নিজের জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে খোদার দ্বীনকে টিকিয়ে রাখার জন্যে। তোমরা তো পৃথিবী দেখনি। দেখনি মুসলমানের ওপর নির্যাতন। শোননি তাদের হাহাকার। যে ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্যে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মহামানব নিজের জবিন তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেন, যার জন্যে হাজারো মুজাহিদের তপ্ত রক্ত পৃথিবীর মাটি লাল করে দিয়েছে, সেই ইসলামই লাঞ্ছিত হচ্ছে মুসলমানদের হাতে।

যাক সে অনেক কথা। নিরাশ হওয়ার কিছুই নেই। অনেক বাধা, অনেক বিপত্তিই আসবে, কিন্তু তবু আমাদের কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই আমাদের শেষ আশা, শেষ ভরসা। আমাদের বিভাগীয় অফিসে যে চিঠি লিখেছিলে, তার জবাব পেয়েছ কি? ওখানে প্রতি মাসেই চিঠি লিখ। আমার শরীর ভাল নয়। দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছি। খোদা হাফেজ।

তোমাদের
আবদুল মালেক

আট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৩ই এপ্রিল, '৬৬

ভাই কামরুল,

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। তোমাদের মত সতেজপ্রাণ মুজাহিদদের কথা স্মরণ হয়ে মনে অনেক আশার সঞ্চার হয়। জানি, যে স্বপ্নে আজ আমরা বিভোর সেই স্বপ্ন তোমাদেরও, সে স্বপ্ন প্রতিটি মুসলিম নওজোয়ানেরই হওয়া উচিত। আমরা চাই দুনিয়ার বুকে একটি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে। আমাদের সে কাফেলার তোমরাই হবে নিশানবর্দার। তোমরাই হবে তার সিপাহসালার।

কামরুল, আমি চাইনা— পৃথিবী চায় তোমরা হবে মু'মিন, মুসলমানও মুজাহিদ। তোমরাই হবে আদর্শ পুরুষ। পৌঢ়দের দ্বারা কোন বিপ্লব হবে না। আলী খালেদ, তারিক, মুহাম্মদ বিন কাশিম আর কোতায়বার মত নওজোয়ানরাই কেবল ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে। সব বাঁধাকে তুচ্ছ করে গাঢ় তমসার বুক চিরে যেদিন আমরা পথ করে নিতে পারব— সেদিন আমরা পৌঁছব এ দুর্গম পথের শেষ মঞ্জিলে। আর সেদিনই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। যেদিন আমাদের চরিত্র হবে হযরত ইউসুফের মত, সেই দিনই কেবল সেই দিনই আসবে সাফল্য। পড়াশুনা খুব ভাল করে করবে ও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে। দোয়া করি খোদা তোমার ও তোমাদের সহায় হোন।

তোমাদের
আবদুল মালেক

ইয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২৬শে জুলাই, '৬৭

ভাই বেলাল,

আসসালাম নিও। ক'দিন আগে তোমার পত্র পেয়েছি; কিন্তু উত্তর দিতে পারিনি সময়মত। গত ১৬ থেকে ২০শে জুলাই পর্যন্ত সংঘের পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক একটি শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হলো। এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বটা আমার ওপরই ছিল। সেখানে গিয়ে হলো জ্বর। তার জের মেটেনি। ডাক্তার বলেন, প্যারাটাইফয়েড হয়েছে। শরীরটাকে এমনভাবে দুর্বল করে দিয়েছে যে, উঠে দাঁড়াতেও কষ্ট হয়। ক'দিন থেকে ভাতের সাথেও সাক্ষাত নেই। এখন অবশ্য সুস্থ অনেকটা। কিন্তু দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

এতো গেল এক দিক। অন্য দিকে ঢাকা শহর সংঘের সভাপতি সাহেব পরীক্ষার জন্য ছুটি নিয়েছেন। ফলে দায়িত্বের একটি পর্বত প্রমান বোঝা আমার মাথায় এসে পড়েছে। আল্লাহ জানেন এ ঝুঁকি কতটা সামলাতে পারব।

সামনে আমার সব কিছুই কেবল শূন্য শূন্য লাগছে। সময় থাকলে একটু বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসতাম। কিন্তু একদিকে দায়িত্বের চাপ, অন্যদিকে ক্লাস পুরোদমে। দোয়া করো আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জান-মাল কুরবানীর যে শপথ নিয়েছি আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে জীবনের বিনিময়ে হলেও যেন তার মর্যাদা রক্ষা করতে পারি। আল্লাহর রব্বুল আলামীনের মেহেরবানী আর তোমাদের দোয়াই আমার এ দুষ্তর পথে আশার আলো।

আল্লাহর কাছে প্রত্যেক নামাযের পরই দোয়া করবে। আল্লাহ তোমাকে সম্পূর্ণ নিরাপময় করে তুলুন, কামনা করি।

(শহীদ আবদুল মারেক এ পত্রের শেষে নিজের নাম লিখেন নি)

দশা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩১শে মে, ১৯৬৯

প্রিয় বেলাল,

আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছ জানিনা। তবে প্রবাসীরা সব সময়ই তাদের আপনজনদের কল্যাণ কামনা নিয়ে বেঁচে থাকে। তোমাদের জন্যে সেই কামনা আমিও করছি। আশা করি, সবাই ভাল আছ। মনের অবস্থাটা খুব বেশি ভাল নয়। এ কথাটা কাউকে বলতেও পারছি না। বিরাট এক আন্দোলনের নগণ্য এক কর্মী আমি। ঢাকা ইসলামী ছাত্রসংঘের মত বিরাট সংগঠন পরিচালনার দায়িত্ব আমায় হাঁপিয়ে তুলেছে। সবাই কর্মী আর এই কর্মীদের পরিচালনার গুরুদায়িত্ব আমার কাঁধেই চেপেছে। তাই মন খারাপ থাকলেও কর্মীদের সামনে জোর করে হাসতে হয়। শরীর খারাপ থাকলেও জোর করে বাইরে বেরুতে হয়। কারণ, আল্লাহর দ্বীনের এ আন্দোলনের সামান্যতম ক্ষতি হোক, এটা চিন্তা করাও মুশকিল। যখন একা থাকি, তখনই যত রাজ্যের চিন্তা এসে মাথায় জট পাকায়। জীবনের এক কঠিন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে আমার প্রতিটি মুহূর্ত কাটছে। গত ক'দিন আগে করাচী গিয়েছিলাম। পশ্চিম পাকিস্তানের কর্মীদের সাথে তৃতীয় বারের মত মোলাকাতের সৌভাগ্য হয়েছিল। ভালই ছিলাম। কিন্তু আরব সাগরের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে এক নতুন উপলব্ধি জেগেছিল। নয়া উপলব্ধি জেগেছিল— যখন সিন্ধুর উঁচু-নিচু পথ বেয়ে আমাদের গাড়িটি ঘন্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটে যাচ্ছিল। ভাবছিলাম এমনিভাবে যদি অনন্তকাল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারতাম। এমনিভাবেই যদি চলতে পারতাম অনন্তকাল ধরে।

পৃথিবীর বুক থেকে বত্রিশ হাজার ফুট উপরে উঠে নীচে তাকিয়ে ছিলাম। ঘর-বাড়িগুলোকে খেলাঘরের মতো দেখাচ্ছিল। বিরাট কলকাতা শহরটিকে একটি ছোট্ট বাজারের মত মনে হচ্ছিল। ভাবছিলাম, আকাশের নিঃসীম নীলিমায় এমনিভাবে যদি উড়ে যেতে পারতাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টি যে কত সুন্দর, তা মেঘের রাজ্যে না গেলে বোঝা যায় না; সমুদ্রের তরঙ্গের সঙ্গে বিকেলের রৌদ্রচ্ছটা না দেখলে অনুমান করা যায় না।

অনেক বড় চিঠি লিখলাম। মনটা বেশি সুস্থ নেই বলেই তোমার সাথে এত কথা বলে মন হালকা করার প্রয়াস। তোমার একটি পত্র পেয়েছিলাম; কিন্তু পত্রটা আমার হাতে পৌঁছতে একমাস সময় লেগেছিল। উত্তর দেইনি, কারণ তুমি পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা কেমন হলো জানিও। কুরবানীতে বাড়ি গিয়েছিলাম। তোমাদের সাথে দেখা করে আসতে পারিনি। যাইনি কোথাও। বাড়িতে দু'দিন থেকে ঢাকা চলে এসেছি। ফেরার সময় তোমাদের উদ্দেশ্যে একটি সালাম জানিয়ে এসেছিলাম। তুমি যদি জানতে বেদনার কতবড় পাথর বুকে চেপে কাটছে আমার প্রতিটি মুহূর্ত! আমি জানি না, আমার জীবনতরীর খেয়াঘাট কোথায়। তবুও চলতে হবে। সংগ্রামের জিন্দেগী মঞ্জিল তো অনেক দূরে। কুরআন ডাকে, 'সেই পথে তীব্র গতিতে ছুটে চল।' তোমার বাড়ির সবাইকে সালাম দিও। তোমার পত্র পাওয়ার আশায় বসে রইলাম।

তোমার ভাই
আবদুল মালেক

এগারো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২৮শে জুন, '৬৯

প্রিয় বেলাল

সালাম ও শুভেচ্ছা নিও। অনেক দিন হলো তোমার চিঠি পেয়েছি। জবাব দিতে বেশ দেরী হয়ে গেল। আশাকরি, মনে কিছু নেবে না। অনেক কথা লিখেছো, মেন্ডুরোর জবাব আমার কাছে নেই। আর থাকলেও দেয়াটাকে সমীচীন মনে করি না। একথা বুঝে নেয়া দরকার, মানুষের জীবন অনেক জোয়ার-ভাটা আর পাওয়া না-পাওয়ার সমষ্টি। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাব্বুল আলামীনের দাসত্ব কবুল করে নিয়েছে, তার দেয়া আইন ও কানুন ছাড়া দুনিয়ায় আর কোন আইন যে মানে না, এক কথায় যে আল্লাহতে পূর্ণ আত্মসমর্পন করেছে, তার মনে দুনিয়ার কোন ব্যথা-বেদনাই অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারে না। নবী, রসূল ও সাহাবায়ে কিরামের জিন্দেগীতে এ সত্যেরই মহাপ্রকাশ ঘটেছে।

আজ ইসলাম ও কুফরে মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাবার সময় কোথায়? তবুও ক্লান্ত মুহূর্তে তোমাদের কথা মনে হয়। শৈশবের আরো অনেক বন্ধু-বান্ধবের কথা মনে পড়ে। কিন্তু তা ক্ষনিকের জন্যই স্মৃতির পাতায় দোলা দিয়ে যায়। জিন্দেগীর চূড়ান্ত মাকসাদ হিসেবে আমি ইসলামী আন্দোলনকেই কুবুল করে নিয়েছি। বস্তুত এ ছিল আমার ঈমানেরই দাবী। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে এ কথাই ঘোষনা করেছেন, 'রসূলকে আমি পাঠিয়েছি হেদায়েত ও সত্য দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা দিয়ে এজন্য যে, তাকে সমস্ত দ্বীন বা জীবন বিধানের ওপর চূড়ান্তভাবে বিজয়ী করতে হবে।'

আজ একথা আমার অন্তরে উচ্চারিত হচ্ছে কেবল নফল ইবাদত আর তসবীহ পড়ে এ তসবীহরদানার ওপরইসলাম কায়েম হবে না।

অনেক কথা বলা হয়ে গেল। দু'দিন পরে কলেজে আসবে। তাই জীবনের মাকসাদ আর একবার স্মরন করে নেয়া দরকার। তোমার আমার মতো হাজারো তরুন আজ ইসলামের জন্য জান দিতে প্রস্তুত। তাদের প্রানে সমাজ ও পরিবারের ছোট-খাট ব্যাথ্যা-বেদনা অনুভব করার সময় কোথায়? আমার বিশ্বাস, জিন্দেগীর সে মঞ্জিলের দিকে তাকিয়েই সবকিছু ভুলে যাবে। সবাইকে সালাম বলো। খোদা হাফেজ।

তোমার ভাই
আবদুল মালেক

এপার থেকে ওপারে

ফজলুল হক হল, ঢাকা

২৪.৮.৬৯

মালেক ভাই,

জানি, তুমি আজ যে জগতে স্থান পেয়েছ তা এ পৃথিবীর সমস্ত কোলাহলের অনেক ঊর্দ্ধে— সত্য আর অসত্যের যে সংগ্রামে তুমি ছিলে এক প্রহরী। আজ সে সংগ্রামেরপথে আত্মদানের পর তুমি নিষ্কৃতি পেয়েছ, দুর্গম যে পথের নির্ভীক যাত্রী হিসেবে স্রষ্টার স্বীকৃতি নিয়ে তারই রাজ্যে পারি জমিয়েছ— যেখানে সত্য, সুন্দর আর শান্তি অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে বিরাজমান, জানিনা যে কর্মব্যস্ততায় ছিল তোমার নিবিড় আসক্তি— যে নিরলস সাধনা ছিল তোমার জীবনের বৈশিষ্ট্য তাকে কেমন করে এখন ঘুমিয়ে রেখছ। অবশ্য যারা ছিল তোমার যাত্রাপথের আলোকবর্তিকা সেই তরুন মুজাহিদরা, যারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে সত্যের মশালকে জ্বালিয়ে গেছেন, আজ তাদের সাথেই হয়েছে তোমার সাক্ষাত, তারাই আজ তামার সহচর। জানো, হিংসে হয় আমার, আমাদেরকে তুমি দিচ্ছ ব্যথা কিন্তু নিজে আজ আনন্দিত হয়েছ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহকে লাভ করে।

তোমার মনে আছে কিনা জানি না, তবে আমার স্মৃতিতে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে সেই দৃশ্যটি জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে যেদিন তোমায় বিদায় দিতে দাঁড়িয়েছিলাম যমুনা তীরে, লঞ্চের উপরে দাঁড়িয়ে তুমি হাত নাড়ছিলে আর আমি তার জওয়াব দিচ্ছিলাম। যমুনার উত্তাল তরঙ্গ তোমায় ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে নিচ্ছিল। যতক্ষন পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছিলাম ততক্ষন এবং তারপরেও আমাদের পারস্পরিক হাত উঠিয়ে বিদায় নেওয়ার পালা চলছিল। কিন্তু যখন তুমি দিগন্তের কোলে মিলিয়ে গেলে তখন আমার দু'চোখে বেয়ে দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু পড়েছিল। কেন যে হঠাৎ মনে হয়েছিল, একদিন এমনি করেই চরে যাবে স্রষ্টার মহান সান্নিধ্যে, আর আমি বঞ্চিত, হতভাগ্য হয়ে তোমায় শুধু বিদায় জানাব। তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ যমুনার সে ব্যবধানের মতই বিরাজ করবে এক বিশাল ব্যবধান তোমার আমার মাঝে। সেদিন কেন হঠাৎ করে এমনি একটি চিন্তা এসে মগজে ঠাঁই পেয়েছিল বুঝতে পারিনি, আজ স্পষ্টই বুঝতে পারছি। মালেক বাই, তোমার মনে আছে কি, রাত তখন তিনটোর মতো হবে। হলে আমার রুমে এসে তুমি মৃদু টোঁকা দিলে আমার দরজায়। ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার। এরপর পূর্ব নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী দু'জনে পোস্টার আর আঠা নিয়ে বের হয়েছিলাম। দারোয়ানের ঘুম ভাঙ্গলে ওর কষ্ট হয় সেজন্য অতবড় লোহার কলাপসিবল গেটটা টপকিয়ে পার হলাম দু'জনে। কার্জন হল, ঢাকা হল আর আমাদের হলে পোস্টার লাগিয়ে হেঁটে চললাম এস.এম হলের দিকে। এস.এম হলের সামনের পলাশ গাছগুলোর পাতার ফাঁকে ফাঁকে রাতের আকাশে আমাদের একমাত্র সহচর চাঁদকানা যখন উঁকি দিচ্ছিল তকন তুমি বলছিলে যে কিভাবে মিশরের বুকে মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতাদেরকে এক এক করে ফাঁসির মঞ্চে চড়ানো হয়েছে, কিভাবে শহীদ সাইয়েদ কুতুব, তার ভাই শহীদ মুহাম্মদ কুতুব, বোন হামিদা কুতুব একে একে ইসলামের জন্য ফাঁসির মঞ্চ আর কারাগারের নির্যাতনকে বেছে নিয়েছিল। কিভাবে তাদের পরিবারের ছোট ১০ বছরের বালক পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে কায়রো নগরীর পথে পথে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার মানসে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার লাগাত।

তোমার দরদভরা কণ্ঠে যেন শুনতে পেয়েছিলাম তাদের কণ্ঠধ্বনি, পত চলতে চবলতে সমস্ত শরীরের পশমগুলো সব কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। শপথ গ্রহন করছিলাম সেদিন আকাশের চাঁদকে সাক্ষী রেখে, আমিও সেই পথে এগিয়ে যাব। রাতের নীরবতার মাঝে ঢাকা নগরীর ঘুমিয়ে পড়া রূপ দেখে, বিশাল নীল আকাশের বুকে জ্যোৎস্নার মায়াভরা আলোর খেলা দেখে, আর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা দূর দূরান্তের সবুজ গাছগুলো দেখে কেমন যেন মনে হয়েছিল, সত্যি এ পৃথিবীটা বড় সুন্দর! আল্লাহর দেওয়া এ সুন্দর পৃথিবীতে তাঁরই দেওয়া জীবন বিধানই মানুষকে শান্তির সন্ধান দিতে পারে।১৯৬৭ সালের একটি রাত্রি। তুমি বাড়ির পথে। স্টেশনে গিয়েছিলাম তোমায় বিদায় দিতে মৃদু আপত্তি তুলেছিলে 'কি দরকার মঞ্জুর ভাই, কেন শুধু শুধু কষ্ট করবেন, আমি তো একাই যেতে পারব।' তোমার সেই মৃদ্যু আপত্তিকে উপেক্ষা করেই সেদিন তোমার সাথে রওনা হয়েছিলাম। নেটা লেট করছিল, প্লাটফর্মের ধার দিয়ে হাঁটছিলাম। ছিন্নমূল কতগুলো পরিবার দিনের বেলায় যারা দুমুঠো অন্নের তাগিদে আশ্রয় নেয় রাজধানীর কোলাহলময় পতের ধারে ধারে আর রাতে বিশ্রাম নেবার জন্য এসে উপস্থিত হয় রেলওয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে। তাদের ঘুমন্ত অবয়বগুলোর দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তুমি বলেছিলে 'মঞ্জু ভাই, এদের কথা ভাবলে আমার আর দেরী সয় না। আর কতদিন এই বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্যে বাকী, যে ইসলামে হযরত উমরের মত খলিফা রাতের অন্ধকারে বেড়াতেন, নিজের কাঁধে ময়দার বস্তা নিয়ে বুভুক্ষুর গৃহে পৌঁছিয়ে দিতেন, যিনি অকপটে ঘোষনা করেছিলেন, 'আমার খিলাফতের অধীন সাধারন মানুষ যা কেতে পায় না, আমার জন্যে তা হারাম। ঐ ফোরাতের কিনারে একটি কুকুরও যদি আজ অভুক্ত থাকে, তার জন্যে আমাকে আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে।' আজ সে ইসলামকে তার সমস্ত সংবেদন শীলতাকে হারিয়ে মসজিদের তসবিহ্ টেপার মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখার এক অশুভ চক্রান্ত গ্রাস করেছে।

পাশ্চাত্যের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ আজ মুসলিম যুবকদের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে। রাজনীতিকে ধর্ম থেকে পৃথক রাখার মন্ত্রকে তারা স্বাগত জানাচ্ছে, অথচ ইসলাম তথা স্রষ্টার দেওয়া সর্বশেষ একমাত্র জীবনবিধান এসেছিল মানুষকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, গোলামী থেকে মুক্ত করে একটি সুখী সমাজ-রাষ্ট্র তথা গোটা মানবজাতির সৃষ্টির মহান মানসে। এ দ্বিমুখী চক্রান্তের ফলশ্রুতি হিসেবে আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি মুসলিম মিল্লাতের এ শোচনীয় অবস্থা, তুমি বলেছিলে, 'জানেন মঞ্জু ভাই, আজও পৃথিবীতে আমাদের এক বিরাট শক্তি ঘুমিয়ে রয়েছে, এ ঘুমন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে আমাদের, আমরা যারা তরুন তাদের উপরই এ দায়িত্ব। নিপীড়িত বঞ্চিত জনতা আজ তাকিয়ে আছে আমাদেরই মুখপানে। তাদের বুকের ব্যথা-বেদনাকে আজ ভাষা দিতে হবে আমাদেরকেই। কিন্তু জানেন আমাদের শত্রুরা সাম্রাজ্যবাদের মরন কামড় আজও হানছে সমাভাবেই। তাইতো দেখি, যাদেরকে দিয়ে আমরা গড়তে পারতাম এক নতুন পৃথিবী, সমগ্র বিশ্বের নির্যাতিত মানবতাকে যারা শান্তির আর মুক্তির পত দেখাতে পারত, তারাই আজ বিদেশী শক্তির প্রবঞ্চনার জালে আটকে গেছে।

হলিউডের উগ্র নগ্নবাদ তাদেরাকে কামনার লেলিহান শিখায় আত্মাহুতি দিতে ডাকছে, বস্তুবাদের চরম শিখরে উঠে ভোগের পেয়ালায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হচ্ছে এরা। জানেন মালেক ভাই, একটি নিষ্পাপ শিশুকে দেখে আমার চোখে পানি আসে। আজকের এ নিষ্পাপ শিশু এ প্রতিকূল পরিবেশে ধীরে ধীরে নিজের অজান্তের জড়িয়ে পড়বে ফাঁদে, তার নিষ্পাপ এ প্রান-মন সব কিছুই ধীরে ধীরে বিদায় নিবে, এ যেন অসহ্য লাগে আমার কাছে। এ পরিবেশ থেকে, এর করাল গ্রাস থেকে ভাবীকালের মিদেরকে মুক্তি

দিতে হবে, তৈরি করতে হবে এমন একটি নির্মল স্বচ্ছ পারিপার্শ্বিকতা, যা অনাদিকালের মানুষকে দিবে সত্যিকারের মানুষ হবার সার্থক প্রেরনা। আমরা গুটিকয়েক তরুন যারা বিশ্বস্রষ্টার মহান কৃপায় হারিয়ে যাইনি এ সর্ববিধ্বংসী স্রোতধারায়, তাদেরকে তৈরি করতে হবে এক নতুন আবর্ত।

রাত সাড়ে এগারোটায় তোমাকে বিদায় দিয়ে ফিরে আসলাম। হলে এসে সহজে ঘুমাতে পারিনি। থেকে থেকে তোমার কথাগুলোই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল মস্তিষ্কের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। তোমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্যে সবচেয়ে বড় ত্যাগ স্বীকার করে তুমি আজ বাকী দায়িত্বটুকু আমাদের কাঁধে অর্পন করে বিদায় নিয়েছ। জানি তোমার এ শূন্যস্থানটি পূরন করা আমাদের কারো একার পক্ষে সম্ভব হবে না, তবে তোমার বিদায়ের সাথে সাথে খাইবার থেকে চট্টলা পর্যন্ত আজ হাজারো কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে শহীদের জয়গান। তারা আজ শপথ নিয়েছে যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে এ পাকভূমিতে আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধান কায়েম করবেই করবে। দুনিয়ার কোন শক্তিই আজ এ কাফেলাকে তার অভীষ্ট লক্ষ্য পথে পৌঁছানো থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হবে না, অন্যায় আর অসত্যের ধ্বজাধারীরা আজ প্রমাদ গুনছে, তারা মরন কামড়ের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে শেষ চেষ্টার পায়তারা করছে, কিন্তু আল-কুরআনের ভাষায়, 'সত্য এসেছে, অসত্য বিদায় নিচ্ছে, নিশ্চয়ই অসত্যের পতন অবশ্যম্ভাবী।' আজ তাই চোখের পানি মুছে ফেলে তোমার ফেলে যাওয়া কাজগুলোকে সমাধা করার দৃপ্ত শপথ নিয়েছি, ওপার থেকে আশীর্বাদ করো যেন এ মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিন্দুমাত্র ভুলও না করে বসি। অবশ্য অসত্য আর অন্যায়ের ভগ্নস্তূপে যেদিন সত্যের আর শান্তিরপতাকা ঊড্ডীন করব, নীল আকাশের নীচে যেদিন তা পত-পত করে উড়বে, সেদিন দু'চোখে হয়তো বা বাষ্পায়িত অশ্রুর মাঝে স্মরন করবে তোমায়।

আর বিশেষ কি লিখব, ধূলি ধূসরিত এ ধরনীর বুকে মানুষ যেদিন থেকে পদার্পন করেছিল, তার পর থেকে যে অগনিত নির্ভীক সেনানী স্রষ্টার দেওয়া সত্য আর ন্যায়ের পাতাকাকে এ ধরনীতে ঊড্ডীন করতে গিয়ে জালেমদের হাতে শাহাদাতের রক্তরাঙা পথে বিদায় নিয়েছে, তাদের প্রতি রইল সংগ্রামী কাফেলার পক্ষ থেকে সালাম।

তোমারই স্নেহের

মঞ্জুর ভাই

শহীদ আবদুল মালেকের
মায়ের কামনা

আমার পুত্রতুল্য ইসলামী ছাত্রসংঘের তরুণ সদস্যরা, আমার আন্তরিক দোয়া জেনো। জানতে পেলাম, তোমাদের ভাই, শহীদ আবদুল মালেকের স্মৃতি 'স্মারক' বের করতে যাচ্ছ। তোমাদের এ উদ্যোগ প্রসংশনীয়।

দুনিয়ার ধন-সম্পত্তি, টাকা-পয়সা ও নাম-যশের কোন লালসাই শহীদ মালেকের ছিল না। আল্লাহর দ্বীন দুনিয়ায় বুলন্দ করা তার জীবনের লক্ষ্য বস্তু ছিল। এজন্য দরকারবোধে জান-মাল হাসিমুখে কুরবান করতে সে প্রস্তুত ছিল। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে সে শক্তি দিন এবং শহীদের অসমাপ্ত কাজ তোমাদের দ্বারা পূর্ণ করে নিন।

আমার স্নেহের দুলাল মুহাম্মদ আবদুল মারেক তোমাদের মধ্যে আর নেই। আছে তার আদর্শটুকু। শহীদ হয়ে সে যে আদর্শ রেখে গেল, বিশ্বের বুকে তোমরা সেই আদর্শই অনুসরন করে তোমাদের কর্তব্যের পথে এগিয়ে চলো। আমার এক আবদুল মারেক গেছে, তোমরা শত শত হাজার হাজার আবদুল মালেক রয়েছ। আদুল মালেকের মত তোমরাও যেন হতে পার। দোয়া করি তোমাদের এ মায়ের মুখকে তোমরা উজ্জ্বল রেখো। আমি দেখতে চাই ইসলামী শিক্ষানীতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ডিগ্রি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক হতে। এটা শুধু তোমাদের কাছে নয়, সরকারের কাছেও আমার আবেদন। হায় আফসোস! আজ পর্যন্তও সরকারকে দেখলাম না আমর পুত্র হত্যার কোন বিচার করতে, দেখলাম না তার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করবার পথে পা বাড়াতে। এটা কি ইসলামী রাষ্ট্র নয়? এই রাষ্ট্রে কি ইসলামের নাম নিলেই আমার পুত্রের মত অবস্থা হবে? আমি দোয়া করি, তোমাদেরকে প্রান ভরে আশীর্বাদ করি, বাছারা, তোমরাই আমার ছেলে, তোমরাই আমার আবদুল মালেক, আবদুল মালেকের মতই হও, আবদুল মালেকের উদ্দেশ্য সফল করো। আমীন।

তোমাদের আশীর্বাদিকা

ছাবিরুন নেছা

(আবদুল মালেক ভাইয়ের শাহাদত স্মরনে প্রথম স্মারন গ্রন্থে শহীদের মায়ের বানী। বর্তমানে তিনি জান্নাতবাসী)

মৃতুহীন প্রাণ

ফররুখ আহমদ

দেখো দেখো শহীদের মুখচ্ছবি উজ্জ্বল অম্লান
সুবে-উম্মীদের দীপ্তকি প্রশান্ত আফতাব রওশন
(দুই জাহানের মাঝে অনিন্দিত, উৎফুল্ল আনন,
ব্যগ্র দৃষ্টি মেলে আছে যার পানে জমিন-আসমান) ।

পরম সাফল্য আর যে পেয়েছে সত্যের সন্ধান,
দুর্লভ সম্ভ্রম আর সৌভাগ্যের অধিকারী সেই
শহীদের মুখচ্ছবি দেখো (ম্লানিমার চিহ্ন নেই;
মহান ত্যাগের পথে সে আজ উন্নত; মহীয়ান) ।

মৃত্যুহীন প্রাণ তার উর্ধ্ব হতে আরো উর্ধ্বস্তরে
উঠে যায় কী সহজে! কী সহজে জান্নাতের পথ
খুলে যায় একে একে প্রেমপন্থী নবীর উম্মৎ;
আল্লাহর স্মরণে যায় উর্দ্ধগতি অনন্ত অম্বরে!
নির্বাক বিস্ময়ে দেখি অকল্পিত শহীদি কিসমৎ
হিংসা হিংস্রতার বাসা পৃথিবীর পথে ও প্রান্তরে ।

শহীদ আবদুল মালেক

ফররুখ আহমদ

যে ছিল জীবন তার
কূট চক্রের বাতেল পন্থীর
সত্যের সৈনিক সেই
মৃত্যুহীন সেই বীর দিলীর ।
মুখে যার ছিল হাসি
বুকে যার প্রজ্জ্বল ঈমান
তরুণ শহীদ সেই
ছিল তব কামিল ইনসান ।
দুঃখে বেদনায় দীপ্ত
সুমধুর তার জিন্দেগানি
আখেরী নবীর পথে
হয়েছিল প্রদীপ্ত নূরানী
ইবলিসের ষড়যন্ত্রে
নিভে গেল অকালে যে প্রাণ
জান্নাতের ফুল হয়ে
ফুটেছে সে এখন অম্লান ।

শহীদ মালেক স্মরণে

আল মাহমুদ

চোখ মুদলেই আমি তোমাকে দেখতে পাই,
মনে হয় মেঘের ভিতর থেকে আলোর বিচ্ছুরিত ফোয়ারা
মনে হয়,
আমাদেরই এক সহযাত্রী অন্ধকারের বেড়া ভাংতে গিয়ে
ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঊনসত্তরের রাত্রির ওপর
আজ যখন দেখি আমাদের জন্য একটি আলোকিত পথ
উদ্ভাসিত হচ্ছে, তখন আমি একাকী তোমার কথা ভাবি।
আবদুল মালেকরা প্রকৃতপক্ষে কখনো একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায়নি
দ্যাখো! অসংখ্য আলোকোজ্জ্বল মুখচ্ছবি এসে
তোমার তৈরি করা পথের উপর দাঁড়িয়েছে।
তাদের বুঝি শেষ নেই।
আমি একজন বৃদ্ধ কবি,
আমিও তোমার পথের উপরই হাতড়ে হাতড়ে দাঁড়িয়েছি।
পাখির কলকাকলির মতো অসংখ্য তরুণ কণ্ঠস্বর
আমার চেবতনাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে।
কে জানে আমার বয়স কত?
কে জানে আমি পৌঁছাতে পারব কিনা,
যদি না-ও পারি, তবে এপথের উপরি আমার অবসান ঘটুক!
এই আমার প্রার্থনা।

শহীদ আব্দুল মালেক রচনাবলী

www.priyoboi.com